৩০ ডিসেম্বর ১৯৮১ • আনন্দবাজার-প্রকাশন •
২/-

ইডেনে ক্রিকেট

আনন্দমেলা

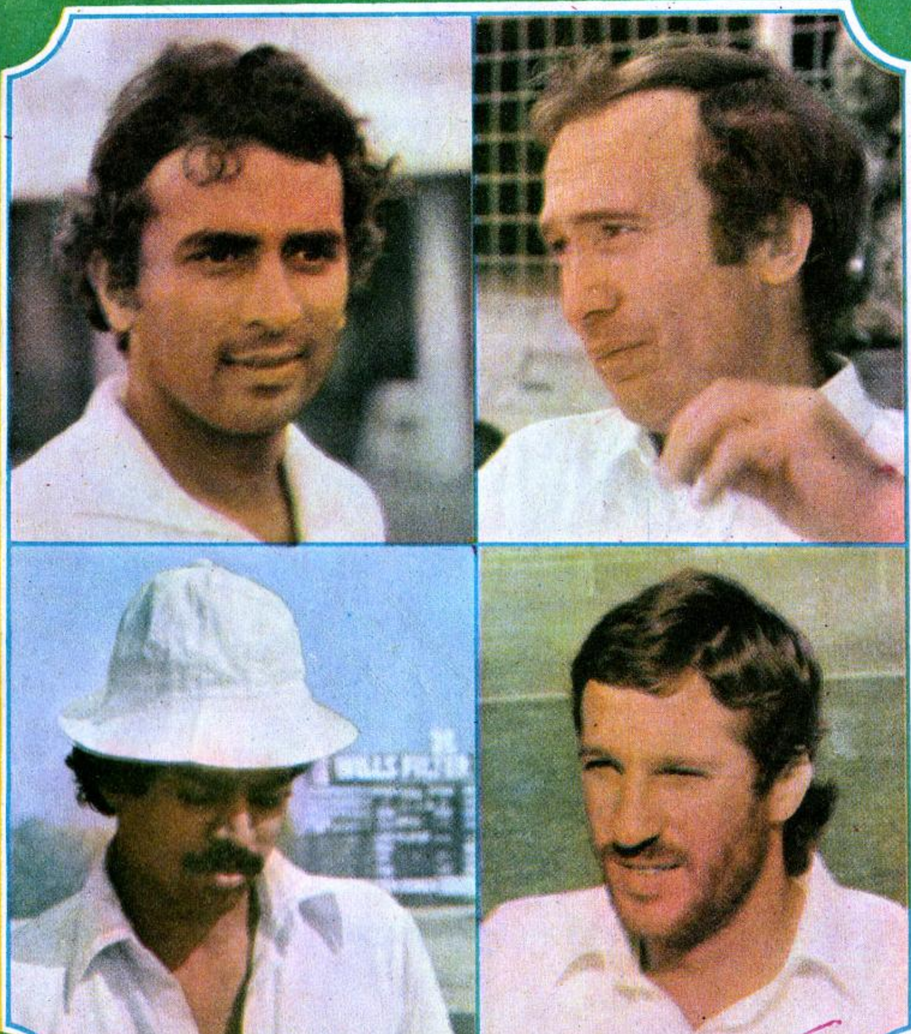

আপনার ত্বকে কুসুম-কোমল লাবণ্য

এনে দেবে

কোল্ড ক্রীম

অফ

রোসেস্

বেঙ্গল কেমিক্যাল

আনন্দমেলা

১৪ পৌষ ১৩৮৮ • ৩০ ডিসেম্বর ১৯৮১ • ৭ বর্ষ • ১৯ সংখ্যা

বিশেষ রচনা
ইংল্যাণ্ডের কে কেমন । অরিজিৎ সেন ৪
অসামান্য জয় । শ্যামসুন্দর ঘোষ ৭
ব্যাটবলের খতিয়ান । ব্যাটবয় ২৭
স্মরণীয় সেঞ্চুরি, ইডেনে । মণীশ মৌলিক ৪২
ফিঙ্গলটনের বিদায় । মণি শর্মা ৪৬
ভারত-ইংল্যাণ্ড, ইডেনে । অশোক রায় ৪৭
আম্পায়াররাও মানুষ । তপন ঘোষ ৫০
ক্রিকেট-শব্দসন্ধান । রঞ্জন ৫১

ভ্রমণকাহিনী
পুনা থেকে গোয়া । নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ৮

উপন্যাস
সিসের আঙটি । বিমল কর ২৪
হারানো কাকাতুয়া । শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ৫২

স্মৃতিকথা
বসু-বাড়ি । শিশিরকুমার বসু ২১

গল্প
বাঘির বন্ধু । সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় ১৭
মনোজের তিন সহযাত্রী । অশেষ চট্টোপাধ্যায় ৫৭

জ্ঞান-বিজ্ঞান
প্লাস্টিক-যুগ । আশিস দেবরায় ৩৬

খেলোয়াড়ের আত্মকথা
উইং থেকে গোল । পি. কে. ৫৪

চিত্রকাহিনী ও কমিকস
সদাশিব ২৮, রোভার্সের রয় ৩০, টিনটিন ৩২,
টারজান ৬০, গাবলু ৬১, ৬৪, বাহাদুর ৬৫

লেখাপড়া
বাংলা বলো । বাচস্পতি ৬২
সহজে ইংরেজি । প্রসাদ ৬৩

অন্যান্য আকর্ষণ
ছবির মজা ১৬, ধাঁধা-মজা-রহস্য ৩৪
তোমাদের পাতা ৩৯, আঁকো-শেখো ৬৬

ইংল্যাণ্ডের ক্রিকেটারদের রঙিন ফোটো ৪, ৫
ভারতীয় ক্রিকেটারদের রঙিন ফোটো ৪১

প্রচ্ছদে গাভাসকার, ফ্লেচার, কপিলদেব ও
বথামের রঙিন ফোটো : নিখিল ভট্টাচার্য

সম্পাদক : নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের পক্ষে বাদপাদিত্য রায় কর্তৃক
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০০১ থেকে প্রকাশিত এবং
আনন্দ অফসেট প্রাইভেট লিমিটেডে পি ২৪৮ সি আই টি রোড
কলকাতা ৭০০ ০৫৪ থেকে মুদ্রিত । দাম দু' টাকা

বিমান মাশুল : ত্রিপুরা ৫ পয়সা । পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য স্থানে ১০ পয়সা
পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-অধিকার কর্তৃক অনুমোদিত শিশুপাঠ্য পত্রিকা।

শঙ্কু ও ফেলুদা সিরিজের
পরে
সত্যজিৎ রায়ের
চমকপ্রদ নতুন সৃষ্টি
তারিণীখুড়ো সিরিজের
প্রথম গল্প

তারিণীখুড়ো ও ডুমনিগড়ের মানুষখেকো

আনন্দমেলা
আগামী সংখ্যায়
(১৩ জানুয়ারি)
প্রকাশিত হচ্ছে

ইংল্যাণ্ডের কে কেমন

অরিজিৎ সেন

ডেরেক আণ্ডারউড

কীথ ফ্লেচার এখন কলকাতায়। সঙ্গে আছেন আজকের ইংল্যাণ্ডের শ্রেষ্ঠ ক্রিকেটাররা। বম্বে, বাঙ্গালোর, দিল্লি ঘুরে এখন তাঁরা চতুর্থ টেস্টের জন্য প্রস্তুত।

খেলা যে-রকমই হোক না কেন, কলকাতার দর্শকরা এবার পৃথিবীর বেশ কয়েকজন সেরা খেলোয়াড়ের খেলা দেখার সুযোগ পাবেন। প্রথমেই নাম করতে হয় ইয়ান বথামের। বথাম অবশ্য এবার দলের নেতা নন। বথামের পক্ষে এটাই ভাল। খুব কম বয়সে অধিনায়ক হওয়ার ফলে বথামের স্বাভাবিক খেলা কিছুটা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। পরপর কয়েকটা টেস্ট খারাপ খেলার পরে ইংল্যাণ্ডের নির্বাচকরা ব্রিয়ারলিকে অধিনায়কত্ব দেন। এর ফল বেশ ভাল হল। বথাম ফিরে পেলেন সেই মারাত্মক বোলিং আর মারমুখী ব্যাটিং। তাঁর এই দুটি গুণ প্রথম আবির্ভাবেই তাঁকে চিহ্নিত করেছিল আজকের ক্রিকেট-জগতের সবচেয়ে ভাল অল-রাউণ্ডার হিসেবে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, গ্যারি সোবার্সের পরে এত কমসংখ্যক টেস্ট খেলে এত সাফল্য আর কোনো অল-রাউণ্ডারই পাননি। বথামকে এখন বলা হয় ইংল্যাণ্ডের 'ওয়ান-ম্যান ব্রিগেড'। অনেকগুলি টেস্টে তিনি একাই খেলার মোড় ঘুরিয়ে দিতে পেরেছেন। নিজের দেশে

বব উইলিস

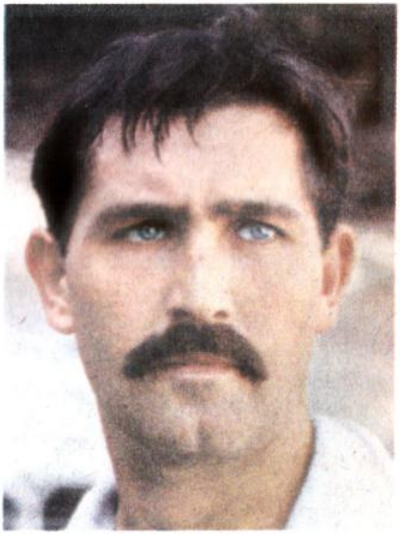

গ্রেহাম গুচ

অস্ট্রেলিয়াকে বিপর্যস্ত করার পরে ভারতে প্রথম তিন-দিনের খেলাতেই তিনি দেখালেন, তাঁর ব্যাটিংয়ের মান কত উন্নত।

শুধুমাত্র ব্যাটিংয়ের কথা বলতে গেলে প্রথমেই নাম করতে হয় ৪১ বছর বয়সী জেফ বয়কটের। বয়কট বেশ কয়েকটি ইনিংস খেলেছেন দেশের এবং তাঁর কাউণ্টি ইয়র্কশায়ারের হয়ে। তবে ক্রিকেট-মাঠে এবং বাইরের জগতে তাঁর সময় ইদানীং ভাল যাচ্ছিল না। তাঁর এককালের অধিনায়ক রে ইলিংওয়ার্থের সঙ্গে তাঁর বিবাদের বৃত্তান্ত সারা পৃথিবীর খবরের কাগজে ফলাও করে ছাপা হয়েছিল। ওদিকে আবার পর-পর কয়েকটি কাউণ্টি খেলায় তাঁর নাম বাদ পড়ায় ইয়র্কশায়ারের ভেতরেও বেশ গোলমাল বেধে গিয়েছিল। শেষে একটি 'আনইজি ট্রুস' হওয়ার ফলে শান্তি ফিরে আসে। কিন্তু এই শান্তি সাময়িক। তাঁকে নিয়ে আবার বিতর্ক শুরু হয়। এবারের ব্যাপারটা আরও মারাত্মক। দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে বয়কটের সম্পর্ক থাকায় ভারত চায়নি যে, বয়কট এবং জেফ কুক ইংল্যাণ্ড দলের সঙ্গে ভারত সফরে আসুক। দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবৈষম্য নীতিই ছিল ভারতের এই মনোভাবের পেছনে। সে-দেশে সাদা চামড়াদের এতই প্রতিপত্তি যে, কালো মানুষরা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রাপ্য সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত বয়কটকে এ-দেশে আসার অনুমতি দিয়েছেন ভারত সরকার।

বয়কটের সঙ্গে এসেছেন কুক। ত্রিশ বছর বয়সের এই খেলোয়াড়টি ভারতে আসার আগে আর কোনো আন্তর্জাতিক খেলা খেলেননি। তবে, এর মধ্যেই প্রথম শ্রেণীর খেলায় ১০,০০০ রান করেছেন। এখন থেকেই তাঁকে ভবিষ্যৎ ইংল্যাণ্ড দলের অধিনায়ক হিসেবে ভাবা হচ্ছে। তিনি শুধু ভাল ব্যাটিংই করেন না, দলকে ভালভাবে চালাবার ক্ষমতাও আছে তাঁর।

অবশ্য, এই দলের সহ-অধিনায়ক নির্বাচিত হয়েছেন বব উইলিস। বত্রিশ বছর বয়সের এই ফাস্ট বোলারকে এর আগেও ভারতে দেখা গেছে। এখন তিনি ওয়ারিকশায়ার কাউণ্টির দলপতি। গত পাঁচ-ছ বছরে অনেকবারই শোনা গেছে যে, 'উইলিস ইজ ফিনিশড্'। কিন্তু তিনি কঠিন পরিশ্রম করে আবার জাতীয় দলের

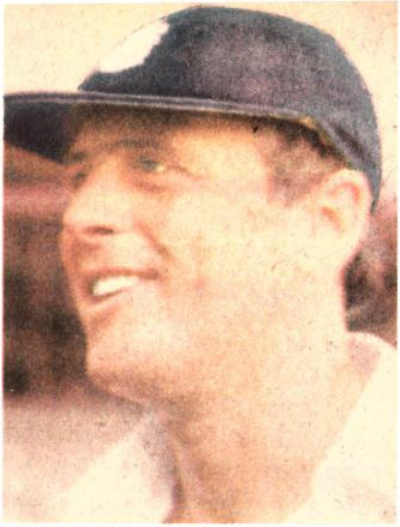

জেফ বয়কট

ডেভিড গাওয়ার

পুরোভাগে ফিরে এসেছেন। এই বছরের মাঝামাঝি সময়ে তিনি এবং বথাম অস্ট্রেলিয়াকে নাজেহাল করে ছেড়েছিলেন। এখন উইলিসের বোলিং অনেক পরিণত। পেস খুব বেশি না হলেও ভেরিয়েশান আছে।

পেস বোলার হিসেবে আর একটি নাম

করতে হয়। পঁচিশ বছর বয়সের পল এলিট এই বছরেই টেস্ট খেলতে শুরু করেছেন। ছ' ফুট চার ইঞ্চি লম্বা এই বোলারটি ব্যাটিংও ভাল করেন। শুধুমাত্র ল্যাঙ্কাশায়ারে নয়, নিজের দেশের হয়ে খেলাতেও অল-রাউণ্ডারের স্বীকৃতি পেয়েছেন এই ডান-হাতি ব্যাটস্‌ম্যান।

এসেক্সের বাঁ-হাতি ফাস্ট বোলার জন লিভার অনেকদিন ধরে টেস্ট খেলছেন। বত্রিশ বছর বয়সী এই খেলোয়াড়ের নাম আছে দক্ষ ফীলডার হিসেবেও। ভারতে আসার আগেই তিনি ষাটটি টেস্ট খেলেছেন। বল যেখানে বেশি সুইং করাতে পেরেছেন, সেখানেই উইকেট পেয়েছেন বেশি। কলকাতার এই আবহাওয়ায় তিনি মারাত্মক হয়ে উঠতে পারেন।

গ্রেহাম ডিলি এই দলের আর-একজন পেস বোলার। বাইশ বছর বয়সের এই খেলোয়াড়টি প্রথম আবির্ভাবেই চমকে দিয়েছিলেন সবাইকে। কিন্তু গত বছরের শেষের দিক থেকে হঠাৎ এমন খারাপ খেলতে আরম্ভ করলেন যে, তাঁর নিজের কাউন্টি তাঁকে প্রথম দল থেকে দ্বিতীয় দলে নামিয়ে দেয়। আমাদের মোহনবাগান বা ইস্টবেঙ্গল থেকে কোনো খেলোয়াড়কে পাওয়ার লীগে নামিয়ে দিলে যেমন হয়, সেই রকম। তবু তাঁকে ইংল্যাণ্ড দলে নেওয়া হয়েছে। কারণ, তিনি আগের টেস্টগুলিতে ভাল খেলেছেন।

দলে আরও দুজন বোলার আছেন, দুজনেই স্পিন বোলার। ছত্রিশ বছর বয়সের ডেরেক আণ্ডারউড, যিনি ৭৯টি টেস্ট ম্যাচে ২৭৯টি উইকেট পেয়েছেন। ন্যাটা স্পিনার হিসেবে তাঁর নাম বেদীর পরেই করা যায়। অন্যজন জন এম্‌বুরে। উনত্রিশ বছর বয়সে ভারতে আসার আগে মাত্র ১৮টি টেস্ট খেলেছেন। কিন্তু, এ দেশে তাঁর দরকার আছে। শেষের দিকে হলেও তিনি ব্যাটসম্যান হিসেবে মন্দ নন।

ইংল্যাণ্ড দলে আর-একজন আছেন, যাঁকে পেস বোলার হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া না হলেও ব্যাটসম্যান হিসেবে দলভুক্ত করা হয়েছে। মাইক গ্যাটিং-এর বয়স এখন ২৪। মিডল্‌সেক্‌স এবং ইংল্যাণ্ড দলে তাঁর ফীলডিং প্রশংসা পেয়েছে।

ওপেনার গ্রেহাম গুচের বয়স ২৮ বছর। পঁয়ত্রিশটি টেস্টে তিনি ২,০০০ রান করেছেন। অথচ, আত্মপ্রকাশ করেন মিডল্‌ অরডার ব্যাট হিসেবে। গ্যাটিংয়ের মতো তিনিও মিডিয়াম পেস বল করতে পারেন।

ভারতের বিরুদ্ধে ২০০ রান খুব কম ব্যাটস্‌ম্যানই করতে পেরেছেন। এই বিরল নিদর্শন রেখেছেন ১৯৭৯ সালে ডেভিড গাওয়ার। চব্বিশ বছর বয়সী ন্যাটা ব্যাটস্‌ম্যান গাওয়ার ৩১টি টেস্টে দু-হাজারেরও বেশি রান করেছেন। ব্যাটিং ও ফীলডিংয়ে দক্ষতা থাকায় ইংল্যাণ্ডের পক্ষে তিনি অপরিহার্য।

ক্রিস ট্যাভারে বেশি দিন টেস্ট খেলছেন না। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে এই বছরের মাঝামাঝি সময়ে তিন নম্বর ব্যাটস্‌ম্যান হিসেবে স্বীকৃতি পান। ওখানে চারটি টেস্টে ২৪৪ রান করে ভারত সফরের সুযোগ পেয়েছেন। স্লিপ ফীলডিংয়ে বেশ নাম।

দলের দুই উইকেটরক্ষক বব টেলর আর জ্যাক রিচার্ডস। দুজনের বয়সের ব্যবধান ১৭ বছরের। টেলরের দুর্ভাগ্য যে, তিনি এলান নটের সঙ্গেই টেস্ট-ক্যাপ প্রার্থী হয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও তিনি টেস্ট রেকর্ড করেছেন বম্বে জুবিলি টেস্টে এক ইনিংসে সাতটি, আর ম্যাচে দশটি স্টাম্প অথবা রান-আউট করার নজির রেখে। চল্লিশ বছর বয়স। এটিই বোধহয় তাঁর শেষ বিদেশ সফর। তাঁর জায়গা নিতে এসেছেন সারে কাউন্টির জ্যাক্‌ রিচার্ডস। ২৩ বছরের জ্যাকের এটিই প্রথম বিদেশ সফর। ব্যাটিং ভাল না করলেও বর্তমানে তিনি নট এবং টেলরের পরে সবচেয়ে ভাল উইকেটকীপার।

সব শেষে নাম করতে হয় অধিনায়ক কীথ ফ্লেচারের। বয়স ৩৭। ভারতে আসার আগে তিনি শেষ খেলেছেন চার বছর আগে মেলবোর্নে। সেটা ছিল ইংল্যাণ্ড-অস্ট্রেলিয়ার সেন্টিনারি টেস্ট। এসেক্সের অধিনায়ক হয়ে এ-বছর কাউন্টি ক্রিকেটে তাঁর সাফল্য, ভাল ব্যাটস্‌ম্যান হিসেবে স্বীকৃতি, এবং ভারতে আসার আগে ভাল খেলার কারণে তিনি সফরকারী দলের অধিনায়ক নির্বাচিত হয়েছেন। ব্রিয়ারলি অবশ্য কয়েকটি টেস্টের সময় ভারতে ছিলেন।

ভারতীয় দলও বেশ শক্তিশালী। কিন্তু কলকাতায় কে জিতবে বলা শক্ত। এখানে টসে যে-দল জিতবে, সেই দলই সুবিধে পাবে বেশি, যদি অবশ্য উইকেট প্রাণবন্ত হয়।

অসামান্য জয়

শ্যামসুন্দর ঘোষ

শাবাশ দিলীপ দোশি, শাবাশ কপিলদেব, শাবাশ মদনলাল। মূলত তাঁদেরই অসামান্য বোলিংয়ের জন্য বোম্বাই শহরের ওয়াংখাড়ে স্টেডিয়ামে তুমুল নাটকীয় উত্তেজনার মধ্যে ভারত শেষপর্যন্ত ইংল্যাণ্ডকে হারিয়ে দিল ১৩৮ রানে। নির্দিষ্ট পাঁচদিনের এই খেলার পরিসমাপ্তি ঘটেছে মাত্র সাড়ে তিনদিনে। আর অনিশ্চয়তা যে ক্রিকেট খেলার অন্যতম বৈশিষ্ট্য, তা বার-বার প্রমাণিত হয়েছে ভারত বনাম ইংল্যাণ্ডের এই প্রথম টেস্টে।

টসে জয়লাভের বাড়তি সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও ভারতীয় দলের প্রথম ইনিংস যখন মাত্র ১৭৯ রানে গুটিয়ে যায়, তখন এদেশের কোনো ক্রিকেট-প্রেমিকই ভাবতে পারেননি যে, ভারত শেষপর্যন্ত জয়লাভ করবে। দ্বিতীয় দিনের মধ্যাহ্নভোজের বিরতি পর্যন্ত ইংল্যাণ্ডেরই প্রাধান্য ছিল। কিন্তু বাংলার দিলীপ দোশির মারাত্মক বোলিংয়ের ফলে ভারতীয়-দল লড়াইয়ে ফিরে আসতে সক্ষম হয়। দোশি উইকেট পান পাঁচটি এবং শেষপর্যন্ত ইংল্যাণ্ডের ইনিংস ১৬৬ রানে শেষ হয়ে যায়।

প্রথম ইনিংসে তেরো রানে

দিলীপ দোশি

কপিলদেব

মদনলাল

এগিয়ে থাকার সুযোগ পেলেন বটে, কিন্তু ভারতীয় দলের নামী ব্যাটসম্যানেরা দ্বিতীয় ইনিংসেও বিশেষ আত্মবিশ্বাস সহকারে ব্যাট করতে পারলেন না। নব্বই রানের মধ্যে ভারতীয় দলের প্রথম সারির পাঁচজন ব্যাটস্‌ম্যান তাঁবুতে ফিরে যান, আর ১৫৭ রানে যখন দলের অষ্টম ব্যাটস্‌ম্যান আউট হন, তখন মনে হয়নি, শেষ দু'উইকেটে ভারত আরও ৭০ রান যোগ করবে। বলতে গেলে এই ৭০ রানই খেলার ভাগ্য অনেকটা নিয়ন্ত্রণ করেছে, আর যে দুই খেলোয়াড় এই রান সংগ্রহে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন, সেই কপিলদেব ও মদনলাল চতুর্থদিনের সকালে নতুন বলে সংহার-মূর্তি ধারণ করেন। কপিল ও মদনলাল মাত্র দুঘণ্টায় অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সদ্য টেস্ট-সিরিজে জয়ী ইংল্যাণ্ডের ব্যাটস্‌ম্যানদের যেভাবে ফিরিয়ে দিয়েছেন, তেমন ঘটনা ইদানীং টেস্ট-সিরিজে আর ঘটেছে কিনা সন্দেহ। একটা গোটা ইনিংস শেষ হয়েছে মাত্র দুঘণ্টায়। একসময় মনে হয়েছিল ভারতের বিরুদ্ধে এটাই হবে ইংল্যাণ্ডের সবচেয়ে কম রানের ইনিংস। ওভালে ১৯৭১ সালে ১০১ রানে ইংল্যাণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হয়েছিল। সে-টেস্ট চন্দ্রশেখরের টেস্ট নামে স্মরণীয় হয়ে আছে, এবং এ-পর্যন্ত ইংল্যাণ্ডের মাটিতে ভারতের ওটাই হচ্ছে একমাত্র টেস্ট-সাফল্য।

ফোটো : নিখিল ভট্টাচার্য

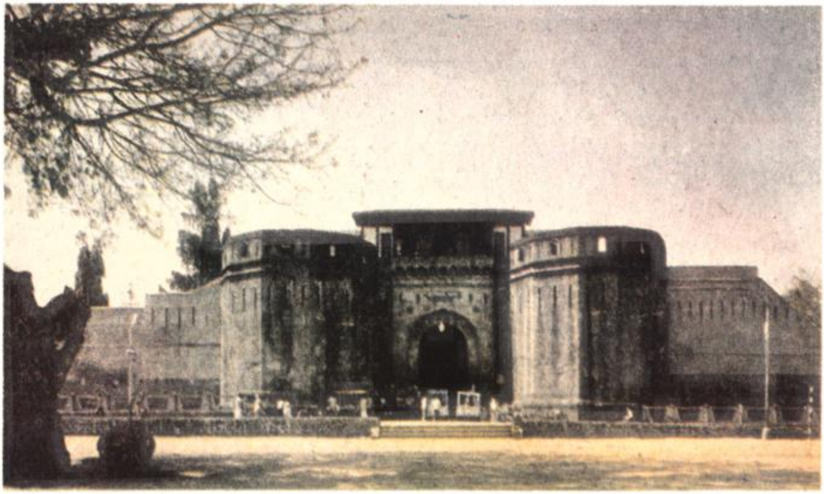

শনিবারওয়াড়ার দুর্গ, পুনা

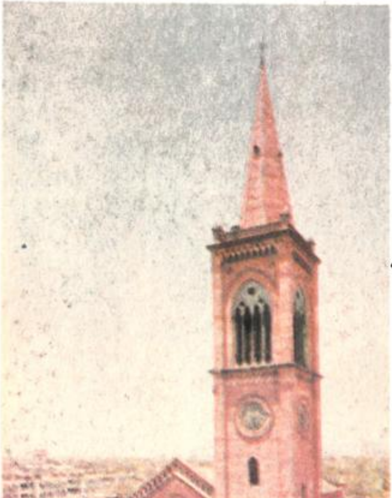

ইহুদি উপাসনালয়, লাল দেবল, পুনা

পুনা থেকে গোয়া

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

আগেও দু'দুবার পুনায় গিয়ে খুব বিপদে পড়েছিলুম। প্রথমবারের কথা বলি। ১৯৭১ সাল। ন্যাশনাল বুক ট্রাস্টের উদ্যোগে পুনার ডেকান কলেজে সেবারে বাংলা, ওড়িয়া, কাশ্মীরী আর সংস্কৃত ভাষার লেখকদের নিয়ে এক 'শিবির'-এর ব্যবস্থা হয়েছিল। কলকাতা থেকে আমরা তিনজন সেই শিবিরে যাই। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, কবিতা সিংহ আর আমি। খেয়ে, ঘুমিয়ে, আড্ডা দিয়ে, পাহাড়িয়া পথে আর মুলামুঠা নদীর ধারে বেড়িয়ে, এবং তারই ফাঁকে-ফাঁকে সাহিত্যের ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান নিয়ে অন্যান্য ভাষার লেখকদের সঙ্গে তুমুল তর্কবিতর্ক চালিয়ে আমাদের দিনগুলি যেন স্বপ্নের মতো কাটছিল। কিন্তু এত সুখ কি আর কপালে সয়? হঠাৎ একদিন অরুণদার ফোন এল। "ওহে নীরেন্দ্র, আমি এখন পুনায় আছি, যদি পারো তো আজকের রাত্তিরটা আমার এই লক্ষ্মীপেটের বাড়িতে এসে কাটিয়ে যাও।"

যেতে হলে শিবিরের কর্তার অনুমতি নিতে হয়। ভাষাতাত্ত্বিক ডঃ কালেলকরকে আমরা

আমাদের অভিভাবক হিসেবে মেনে নিয়েছিলুম। তাঁর কাছে গিয়ে অনুমতি চাইতে তিনি বললেন, "যাবে বই কী, একশোবার যাবে। তবে হ্যাঁ, যাওয়া চলবে, কিন্তু খাওয়া চলবে না। রাত্তিরে আমার বাংলোয় আজ ডিনার খাও, তারপর আমি তোমার সঙ্গে একজন ওস্তাদ-লোক দিয়ে দেব, সে গিয়ে তোমাকে তোমার দাদার বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসবে।"

ডিনার সাঙ্গ হল রাত সাড়ে-এগারোটায়। কালেলকর-সাহেবের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে স্কুটার-ট্যাক্সিতে চেপে যখন লক্ষ্মীপেটের উদ্দেশে রওনা হলুম, ঘিয়েভাজা গোটাকতক নেড়িকুত্তা ছাড়া গোটা পুনা শহরে তখন আর একটি প্রাণীও সম্ভবত জেগে নেই। স্কুটারের ভট-ভট আওয়াজ শুনে সেই নেড়িকুত্তাগুলি এইসা চিল্লাচিল্লি লাগিয়ে দিল যে, সে আর কহতব্য নয়।

অরুণদা তাঁর বাড়ির নম্বর দেননি, শুধু ভাসা-ভাসা একটা ডিরেকশন দিয়েছিলেন। লক্ষ্মীপেট-এলাকায় ক্রমাগত চক্কর মারতে-মারতে একসময় ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলুম, রাত দেড়টা বাজে। বুঝতে পারলুম, ডিরেকশনের বিন্দুবিসর্গও স্কুটারওয়ালা বোঝেনি। ডঃ কালেলকরের দেওয়া ওস্তাদ-লোকটি এতক্ষণ আমার পাশে বসে নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছিল। ঠেলা মেরে জাগিয়ে তুলে তাকে জিজ্ঞেস করলুম, "কী হে, কিছু ঠাহর হচ্ছে?" তাতে সে দু'হাতের পাতা উলটে, কাঁধ ঝাঁকিয়ে, বেজার গলায় বলল, "আমার আবার কী ঠাহর হবে? আমি তো সবে গতকাল এই শহরে এসেছি। হাঁ, হত যদি কোলাপুর, তো এতক্ষণে আমি ঠিক-ঠিকানায় আপনাকে পৌঁছে দিতুম। কিন্তু এ তো আর কোলাপুর নয়, এ হচ্ছে পুনে, এখানকার রাস্তাঘাট আমি চিনি না।"

শুনে তো আমার আক্কেল গুড়ুম। তাহলে উপায়? একমাত্র উপায় থানা। কাছের একটা থানায় গিয়ে সমস্ত কথা বুঝিয়ে বলতে সেখানকার ও. সি. কীভাবে অরুণদাকে ফোন করে তাঁর বাড়ির নম্বর জেনে নেন, এবং পুলিশের গাড়িতে চড়িয়ে রাত আড়াইটের সময় কীভাবে আমাকে পৌঁছে দেন সেই বাড়িতে, বিস্তারিতভাবে আর সে-সব কথা এখানে বলতে চাই না; শুধু এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, সেই থেকেই আমি পুনার নাম শুনলে ভয় পাই।

অথচ পুনা যে কী সুন্দর শহর, সে আর তোমাদের কী বলব। আমরা বলি পুনা, কিন্তু মারাঠিরা বলেন পুনে। তাঁরা আরও বলেন যে, পুনেই হচ্ছে মহারাষ্ট্রের সাংস্কৃতিক রাজধানী। আর বোম্বাই? "আরে দূর দূর, ও তো নেহাতই

এই দেখ, আমার
জন্মদিনের উপহার
ইউকোব্যাঙ্ক-এর
পাসবই
ভারী মজার। এই একটা উপহার আমাকে বছর বছর উপহার এনে দেবে। ইউকোব্যাঙ্ক পাস বইয়ের মজাই তো ঐখানে।
ভাগ্যিস্, মার মাথায় বুদ্ধিটা এসেছিল। অবশ্য ইউকোব্যাঙ্ককেও ধন্যবাদ দিই—আমার জমা পয়সা বছর বছর বাড়িয়ে তোলার জন্যে।
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক
ইউকোব্যাঙ্ক কাছেই আছে, ইউকোব্যাঙ্কে টাকা জমান।
UCO/CAS-69/80 BEN

বানিয়াদের জায়গা, ওখানকার লোকরা শুধু পয়সা কামাতেই শিখেছে!"

কথাটা সত্যি কি না, কে জানে। তবে হ্যাঁ, দিনকয়েক বোম্বাইয়ে কাটিয়ে যদি পুনায় যাও, তাহলে কিন্তু চট্ করে আর বোম্বাইয়ে ফিরতে ইচ্ছে হবে না। বোম্বাই থেকে পুনা যাবার পথটাই তো দারুণ। খানিকটা পথ সমতল দিয়ে যাবার পর রেলগাড়ি আস্তে-আস্তে পাহাড়ের উপরে উঠতে লাগল, মাঝে-মাঝেই মস্ত-মস্ত টানেল, গাড়ি গিয়ে টানেলে ঢুকতেই সব অমনি মিশকালো অন্ধকার, তারপর টানেল থেকে বেরিয়ে আসতেই দুদিকে আবার সবুজ কার্পেটের মতো উপত্যকা, সেই উপত্যকার মধ্যে ছোট-ছোট ঘরবাড়ি, তার লাল টালির ছাতের উপরে রোদ্দুর পড়েছে, ঝরনা দিয়ে নেমে আসছে সরু রুপোলি সুতোর মতো চিকচিকে জলধারা, শিঙে-রং-মাখানো গোরু চরছে পাহাড়ের গায়ে, সব মিলিয়ে তোমার মনে হবে যেন দারুণ সুন্দর একটা স্বপ্ন দেখতে-দেখতে চলেছ। তারপর যখন পুনায় এসে পৌঁছলে, তখন তো কথাই নেই। ছবির মতো শহর। এখানে-ওখানে ঘিঞ্জি গোটাকয় এলাকা যে নেই, তা নয়, কিন্তু ফাঁকা জায়গাও আছে অনেকখানি। আছে মস্ত-মস্ত মাঠ আর বাগান। আছে দুর্গ, নাট্যশালা, ফিল্‌ম ইনস্টিটিউট আর চমৎকার সব মিউজিয়ম।

এই পুনারই 'আগা খাঁ প্যালেস'-এ মহাত্মা গান্ধীকে অনেকদিন বন্দী করে রাখা হয়েছিল। এখন সেখানে গান্ধীজির নামে একটি সংগ্রহশালা গড়ে তোলা হয়েছে। সংগ্রহশালা দেখে ফিরবার পথে শহরের মধ্যেই পড়বে মুলামুঠা নদী। মাঝখানে বাঁধ, সেই বাঁধ ছাপিয়ে দারুণ চওড়া একটা প্রপাতের মতো তার জলধারা যেন লাফিয়ে নামছে নীচের পাথরে। বিশ্ববিদ্যালয়টাই বা কী সুন্দর। বিরাট এলাকা, তার মধ্যে যত না ঘরবাড়ি, তার চেয়ে বেশি বাগান। পথের দুদিকে গাছপালা। সেই পথ দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে মনে হবে যেন বোটানিক্যাল গার্ডেনের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছ।

তাই বলে কি পুনা একটা পুঁচকে শহর? মোটেই না। প্রচুর লোক, প্রচুর দোকান-পাট, প্রচুর কল-কারখানা। তোমরা নিশ্চয় জানো যে, শিল্প-নগর হিসেবেও পুনার গুরুত্ব আজকাল নেহাত কম নয়। কিন্তু শিল্পের প্রসার পুনাকে মোটেই কুশ্রী করতে পারেনি। সব মিলিয়ে মনে হয় যেন এ একেবারে পটে-আঁকা ছবির মতো একটা ব্যাপার।

সিংহগড়ও খুব দূরে নয়। ঘুম থেকে একটু তাড়াতাড়ি উঠে, মুখ-চোখ ধুয়ে একটা ট্যাক্সি নিয়ে যদি পুনা থেকে বেরিয়ে পড়ো তো পাহাড়ে উঠে, শিবাজি-মহারাজার এই বিখ্যাত দুর্গটিকে দেখে আবার দুপুরের মধ্যেই পুনায় ফিরে মধ্যাহ্নভোজ সারতে পারবে। তোমরা তো ইতিহাস পড়েছ, তাই নিশ্চয় জানো যে, শিবাজির সেনাপতি তানাজি কীভাবে খাড়াই পাহাড়ে উঠে পাঁচিল টপকে ভিতরে ঢুকে অতর্কিতে শত্রুপক্ষের উপরে হানা দিয়ে এই দুর্গটি উদ্ধার করেছিলেন। তানাজি নিজে অবশ্য সেদিনকার যুদ্ধে প্রাণ হারান, কিন্তু মারাঠিরা আজও খুব গর্বের সঙ্গে তাঁর বীরত্বের কথা সবাইকে বলেন। বাঙালি কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচীর কবিতার মধ্যেও তাঁর বীরত্বের কাহিনী খুব সুন্দর ফুটেছে। "সিংহগড়ের সিংহ গিয়াছে, পড়ে আছে শুধু গড়, / তাই লও মাতা হারায়ে পুত্র তানাজি মালেশ্বর।" কবিতার এই লাইন দুটি নিশ্চয় মনে আছে তোমাদের। তা পুনায় গেলে সেই সিংহগড়কে একবার দেখে আসবে না?

আমি গিয়েছিলুম ১৯৭৯ সালে। পুনায় সেই আমার দ্বিতীয় যাওয়া। সেবারে সঙ্গে ছিলেন তোমাদের প্রিয় শিল্পী বিমল দাস। 'সদাশিব'-এর ছবি আঁকবার জন্যে মহারাষ্ট্রের গ্রামাঞ্চল, পাহাড়, দুর্গ ইত্যাদি তো খুব ভালভাবে দেখা দরকার। বিমল তখন তাই মহারাষ্ট্রের হরেক মিউজিয়মে আর পাহাড়িয়া এলাকায় খুব ঘুরে বেড়াত, আর ড্রইং বুকের পাতায় পটাপট স্কেচ করে ফেলত সবকিছুর। আমার মনে আছে, সিংহগড় দেখে বিমল বলেছিল, "নীরেনদা, এই জায়গাটাকে যেন ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করছে না।"

তোমরাও সিংহগড় দেখবে নিশ্চয়। চাই কী, একদিন একটু সময় করে পুনার কেলকর মিউজিয়মে গিয়ে শিবাজির 'বাঘনখ' অস্ত্রও তোমরা দেখে আসতে পারো।

ঘুরতে-ঘুরতে যদি ক্লান্ত হয়ে পড়ো, তো ক্লান্তি মিটিয়ে দেবার জন্যে রয়েছে 'রসবন্তী', অর্থাৎ আখের রস। প্রতি রাস্তায় রসবন্তীর দোকান; কলে আখ মেড়ে, সেই রসে লেবু আর

শীত পড়ে গেল

অন্য যে-কোনো ঋতুর চেয়ে এখনই আপনার বেশী দরকার

কেয়ো-কার্পিন ম্যাসাজ অয়েল

ত্বকের সম্পূর্ণ সুরক্ষায় অপরিহার্য

অন্য যে-কোনো ঋতুর চেয়ে শীতেই আপনার ত্বক স্পর্শ-কাতর হয়ে ওঠে বেশী। উত্তুরে হাওয়ার প্রকোপ ছড়িয়ে পড়ে চারিদিকে। বাচ্চা আর শিশুরাই হয় বেশী আক্রান্ত—গায়ের চামড়া হয়ে ওঠে শুকনো, ফাটা-ফাটা আর খসখসে। শীতের মাসগুলোয় ত্বকের এইসব সমস্যায় একমাত্র সুরাহা কেয়ো-কার্পিন ম্যাসাজ অয়েল। এতে আছে ত্বকের স্বাস্থ্য রক্ষায় অপরিহার্য তিনটি প্রয়োজনীয় ভিটামিন (ই,এ এবং ডি)।

শীতে কেয়ো-কার্পিন ম্যাসাজ অয়েল নিয়মিত ব্যবহার করলে ত্বকের খসখসে, ফাটা-ফাটা ভাব দূর হবে, আর ত্বকের চেহারাও হয়ে উঠবে রেশমের মতো মসৃণ।

কেয়ো-কার্পিন ম্যাসাজ অয়েল। শীতে আপনার সঙ্গী। আপনার ছেলে-মেয়ের ও পরিবারের সকলের সঙ্গী।

মোলায়েম বেস-নির্ভর এতে আছে অলিভ অয়েল, ল্যানোলিন ও চন্দন তেল

Dey's

দে'জ এর একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

৬০ ও ১৮০ এম.এল.প্যাকে পাবেন

PX/KMO/B-4B/81/0

আদা মিশিয়ে তোমাকে খেতে দেবে, এক গ্লাস খেলেই মনে হবে, আঃ, প্রাণ যেন জুড়িয়ে গেল।

কিন্তু এত যে প্রশংসা করছি, সেবারেও আমি পুনায় গিয়ে খুব বিপদে পড়ি। দিনকয়েক পুনায় কাটিয়ে বোম্বাইয়ে ফিরব। সাত-সকালে ট্রেন। শেষ রাত্তিরে ঘুম থেকে উঠে, হোটেলের বিল মিটিয়ে, একটা স্কুটার-ট্যাক্সি নিয়ে পুনা স্টেশনে এসেছি, হঠাৎ মনে পড়ল মনিব্যাগটা সঙ্গে আনিনি। বালিশের তলায় মনিব্যাগ রেখে শুই, সেইখানেই সেটা পড়ে আছে। ছোট্, ছোট্। আবার স্কুটার-ট্যাক্সি নিয়ে হোটেলে ফিরলুম। বেয়ারা তখনও ঘুমোচ্ছে। ঘুম থেকে তাকে তুলে দিয়ে, ঘরের দরজা খুলিয়ে, মনিব্যাগ উদ্ধার করে, আবার ট্যাক্সি ছুটিয়ে যখন স্টেশনে এসে পৌঁছলুম আমরা, গার্ডসাহেব তখন হুইসল্ বাজিয়ে দিয়েছেন। আমরাও গিয়ে লাফ দিয়ে একটা কামরার মধ্যে উঠে পড়লুম, আর ট্রেনের চাকাও অমনি ঘুরতে আরম্ভ করল।

তখনই মনে-মনে ঠিক করে ফেলেছিলুম যে, ঢের হয়েছে, আর-কখনো পুনায় আসব না। অথচ, কী তাজ্জব ব্যাপার দ্যাখো, দলবলের পাল্লায় পড়ে সেই পুনাতেই ফের আসতে হল। এবারে তো আর একা-একা কিংবা দু-একজন মাত্র সঙ্গী নিয়ে ঘুরছি না, ঘুরছি একটা মস্ত বড় দলের সঙ্গে। বরানগরের শান্তি সঙ্ঘ পাঠাগারের সেই দলের সঙ্গে হাওড়া থেকে গীতাঞ্জলি এক্সপ্রেসে উঠে ভুসোয়ালে এসে নামি। তারপর ভুসোয়াল থেকে রিজার্ভ-করা বাসে উঠে চলে আসি ফর্দাপুরে। ফর্দাপুরের খুব কাছেই হচ্ছে অজন্তা। অজন্তার গুহাচিত্রাবলী দেখে আমরা ঔরঙ্গাবাদে চলে আসি। সেখান থেকে দেখি ইলোরার গুহাভাস্কর্য আর দৌলতাবাদ দুর্গ। ১৯৫৭ সালেও একবার অজন্তা-ইলোরা দেখতে এসেছিলুম। সেবারে এসেছিলুম জলগাঁও হয়ে। তা ভেবেছিলুম যে, সেবারকার মতো এবারেও আমরা ঔরঙ্গাবাদ থেকে ট্রেনে উঠে মনমদ স্টেশনে ট্রেন পালটে বোম্বাই যাব, তারপর সেখান থেকে জাহাজে করে যাব গোয়ায়।

কিন্তু তা আর হল কোথায়? দলের সবাই পুনাটাও এক পলক দেখতে চান। তাই ঠিক হয়েছে যে, ঔরঙ্গাবাদ থেকে ভোরবেলাকার বাসে উঠে আমরা দুপুর একটা নাগাদ পুনায় গিয়ে পৌঁছব, তারপর খেয়ে-দেয়ে বিকেলবেলায় পুনা শহরে একটা চক্কর লাগিয়ে, হোটেলে ফিরে, ঘণ্টা কয়েক বিশ্রাম নিয়ে, বাসে করে চলে যাব গোয়ায়। বাস পুনা ছাড়বে রাত চারটেয়, আর গোয়ার পানাজি শহরে পৌঁছবে পরদিন সন্ধে ছটায়।

তা ঔরঙ্গাবাদ থেকে তো ভালয়-ভালয় পুনায় এসে পৌঁছনো গেল। রেল-স্টেশনের কাছে মস্ত বড় বাস-টার্মিনাল। সেখান থেকে হাঁটা-পথে আমাদের হোটেল মাত্র পনেরো মিনিট। ভাগ্যিস সেই পথটুকু পায়ে হেঁটেই পাড়ি দিয়েছিলুম, নয়তো রাত্তিরে আবার সেই দশ বছর আগেকার মতোই আমাকে থানায় দৌড়তে হত। কী হয়েছিল জানো? ঠিক ছিল যে, বিকেলবেলায় একটা রিজার্ভ-করা বাসে উঠে আমরা পুনার সব দ্রষ্টব্য জায়গাগুলো দেখে নেব। তা জায়গাগুলো দেখিয়ে-টেখিয়ে বাস যখন ফের হোটেলে ফিরছে, দুই মেয়ে তখন বায়না ধরল যে, পুনার বাজার থেকে তারা শোলাপুরী শাড়ি কিনবে। গাইড বলল, "শাড়ি যদি কিনতে হয় তো এই লক্ষ্মীপেট এলাকাতেই নেমে পড়ুন, এর চেয়ে ভাল দোকান আর কোথাও পাবেন না।"

এই রে, আবার সেই লক্ষ্মীপেট! ঢোঁক গিলে তো বাস থেকে নেমে পড়লুম আমরা। তারপর শাড়ি-টাড়ি কিনে, রসবন্তী খেয়ে যখন একটা স্কুটার-ট্যাক্সিতে উঠলুম, তখন ঝপ করে হঠাৎ মনে পড়ল যে, সর্বনাশ, হোটেলটা যে কোন্ রাস্তায়, তা-ই তো আমার মনে নেই।

ছোট হোটেল, নাম বললে যে তক্ষুনি কেউ চিনতে পারবে, এমন ভরসা করা যাচ্ছে না, তবু স্কুটারওয়ালা যখন একগাল হেসে বলল, "হোটেল টুরিস্ট তো? ঠিক আছে, বিশ মিনিটের মধ্যে পৌঁছে যাব," তখন ভাবলুম, যাক বাবা, এবারে তাহলে নিশ্চিন্ত। কিন্তু, হায়, বিশ মিনিটের জায়গায় দু ঘণ্টা কেটে গেল, তবু সেই হোটেলের দেখা নেই। স্কুটারওয়ালারও এদিকে মেজাজ অতিশয় তিরিক্ষে হয়ে উঠেছে, বারবার সে বলছে, "আপনাকে সওয়ারি নিয়ে ভুল করেছি সাব, দয়া করে এবারে আমাকে ছেড়ে দিন।"

দু দিকে তাকিয়ে মনে হল, বিশ্ববিদ্যালয়-এলাকায় এসে ঘুরপাক খাচ্ছি।

সহজ পাঠ

যেমন তেমন নইকো আমি
ছোট্ট অ্যালার্ম ঘড়ি
যেমনি বলন তেমনি চলন
বাই যে সময় তরী !

প্রেক্স মিনিক্লকস প্রাঃ লিঃ
৩৪; রিজেণ্ট পার্ক, কলিকাতা-৭০০০৪০

যাচ্চলে, এখানে নিয়ে এল কেন? সত্যি বলতে কী, আমার কান্না পাচ্ছিল। রাত চারটেয় গোয়ার বাস পুনা ছাড়বে, আর আমরা কিনা এখন হোটেলটাকেই খুঁজে পাচ্ছি না! কেন যে মরতে আবার লক্ষ্মীপেটে এসেছিলুম। মরিয়া হয়ে স্কুটারওয়ালাকে বললুম, "দ্যাখো ভাই, ঔরঙ্গাবাদ থেকে বাস এসে যেখানে থামে, তুমি বরং সেইখানে নিয়ে গিয়ে আমাদের নামিয়ে দাও।"

তা, শেষপর্যন্ত তা-ই হল। ভাগ্যিস সেই-দুপুরবেলায় এই বাস-টার্মিনাল থেকে হোটেলে যাবার পথটা চিনে রেখেছিলুম, তাই আর বিশেষ কষ্ট হল না। হোটেলে পৌঁছলুম রাত এগারোটায়। রিসেপশান কাউন্টারের সামনে অরুণ, কমলেশ, মনোময়, সঞ্জীব, প্রদীপ এবং আরও অনেকে একেবারে শুকনো মুখে দাঁড়িয়ে ছিল। আমাদের দেখে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল তারা।

কিন্তু শেষ রাত্তিরে আমাদের লাক্সারি বাস যখন পুনা থেকে গোয়ার পথে রওনা হল, পথ হারাবার সমস্ত কষ্ট তখন যেন নিমেষে আমরা ভুলে গেলুম। শহরের এলাকা ছাড়িয়ে পাহাড়িয়া পথে ক্রমেই আরও উঁচুতে উঠছি। এক সময়ে পিছনে তাকিয়ে দেখলুম, পুনা শহর যেন অসংখ্য আলোর পুঁতি দিয়ে গাঁথা মস্ত একটা নেকলেসের মতো জ্বলজ্বল করে জ্বলছে। সেদিন আবার ছিল পূর্ণিমার রাত। আকাশে জ্যোৎস্নার বান ডেকেছে। সেই জ্যোৎস্নার মধ্যে থাক-থাক মেঘের মতো ছড়িয়ে রয়েছে পর্বতমালা। পাহাড় আর পাহাড়। আমাদের বাস সেই পাহাড়ের গা বেয়ে কখনো একটু নীচে নামছে, আবার পরক্ষণেই গোঁ-গোঁ করতে করতে উঠে যাচ্ছে শিখরের দিকে। হঠাৎ কে যেন বলে উঠল, "আরে, আরে, বাঁ দিকে একবার দ্যাখো।"

বাঁয়ে তাকিয়ে দেখি, দুই পাহাড়ের সন্ধিস্থলে আকাশটা একেবারে ডগডগে লাল হয়ে উঠেছে, আর তারই মধ্যে উঁকি মারছেন সূর্যদেব। অথচ আমাদের ডাইনে তখনো পূর্ণিমার চাঁদ। চাঁদের গা থেকে সোনালি ছোপ মুছে গিয়ে ইতিমধ্যে রুপোলি রঙ ধরেছে। সে যে কী অপরূপ ব্যাপার, তা কি আর বর্ণনা দিয়ে বোঝানো যাবে। মনে-মনে বললুম, ভাগ্যিস আবার পুনায় এসেছিলুম, তা নইলে তো এই আশ্চর্য, অবিস্মরণীয় দৃশ্য আমার দেখাই হত না।

বেলা আটটায় করড়ে পৌঁছলুম। পাহাড়ের কোলে বর্ধিষ্ণু একটা আধা-শহর জায়গা। বাসের মধ্যেই আমাদের হাতে-হাতে ব্রেকফাস্ট ধরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এবারে আমরা করড়ে নেমে একটা দোকানে ঢুকে সবাই চা খেয়ে নিলুম। একটানা ঘণ্টাচারেক বাস-জার্নি করলে শরীরে একটা আড়ষ্ট ভাব এসে যায়, তাই একটু হাত-পা টান করে নেবারও দরকার ছিল। করড়ে কলা বেশ শস্তা। তবে ভুসোয়ালের মতো অত শস্তা নয়। কলকাতায় যে সবুজ রঙের কলা দেখতে পাও তার একটা মস্ত অংশই আসে ভুসোয়াল থেকে। অজন্তায় যাবার পথে সেখান থেকে কলা কেনা হয়েছিল। বেশ বড় সাইজের এক ডজন কলার দাম এক টাকা। অথচ কলকাতায় সেই কলা টাকায় চারটের বেশি মেলে না। মজা কী জানো, কলকাতায় কলা চালান দিয়ে ভুসোয়ালের চাষিরা যে খুব লাভ করছে, তাও হয়তো নয়। চাষি আর খরিদ্দারের মাঝখানে আছে মহাজন, আছে পাইকার। লাভের টাকার অনেকটা চলে যায় তাদেরই পকেটে, চাষির ভাগ্যে বিশেষ কিছু জোটে না।

করড়ের পরে কোলাপুর। বেশ বড় শহর। রাস্তা তত চওড়া না হোক, দোকানপাট বেশ সাজানো। চৌমাথায় ট্রাফিক পুলিশ হাত তুলে যানবাহন নিয়ন্ত্রণ করছে। জমজমাট গোটাকয়েক হোটেল-রেস্তোরাঁও চোখে পড়ল। দুপুরের খাওয়াটা কোলাপুরে সেরে নিলেই দিব্যি হত, কিন্তু সঙ্গী-সাথীদের অনেকেই বললেন যে, এত তাড়াতাড়ি খাওয়া যাবে না, তার চেয়ে বরং কোলাপুরী চপ্পল কেনা যাক। কেউ-কেউ কিনলেনও, কিন্তু দামে যে খুব সুবিধে হল, তা নয়। আমার তো মনে হল, এর চেয়ে কম দামে কলকাতার কলেজ স্ট্রীট থেকেও এই রকমের কোলাপুরী চপ্পল কেনা যেত। আসল কথা, সব জায়গার দোকানিরাই বুঝতে পারে যে, কে স্থানীয় মানুষ, আর কে বাইরের লোক। বাইরের লোকরা যে টাকা খরচ করতেই এসেছে, সেটাও তারা বোঝে। খদ্দেরের গরজ বুঝে দামও তারা বাড়িয়ে দেয়। বাইরে গিয়ে হুটপাট করে তাই কিছু না-কেনাই ভাল।

একটা নাগাদ আমরা রাধানগরীতে

ছবির মজা

রঙ-পেনসিল বুলিয়ে এই ছবিটিকে রঙিন করো। কিন্তু তার আগে তোমার ছোট্ট ভাই কিংবা বোনকে বলো, ছবির ভিতরকার শুঁয়োপোকাগুলিকে সে খুঁজে বার করুক।

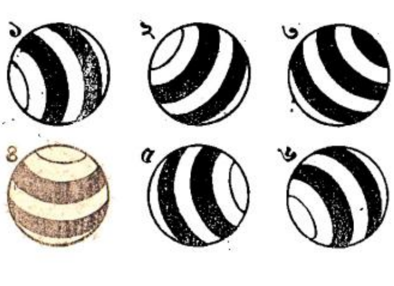

ছটি বলই কি হুবহু একরকম? খুব ভাল করে দেখে তারপর উত্তর দাও।

(না, ৩-নং বলের মাথাটাও কালো, যা কিনা অন্য বলগুলির নয়।)

পৌঁছলুম। এও দিব্যি জায়গা। দুদিকে পাহাড়। সেই পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে বাড়িঘর, দোকানপাট। দ্বিপ্রাহরিক ভোজনের জন্যে আমরা যে-দোকানটায় প্রথমে ঢুকেছিলুম, তাতে জনা-চল্লিশেক লোকের মতো ভাত-ডাল-সবজি ছিল। ফলে বাদবাকি লোককে পাহাড়ের গা বেয়ে আরও খানিকটা উপরে উঠে আর-একটা দোকান থেকে খেয়ে আসতে হল।

একটা ব্যাপার ইতিমধ্যে আমরা সবাই লক্ষ করেছিলুম। সেটা এই যে, পর্বতমালা কিছুতেই ফুরোচ্ছে না বটে, কিন্তু গাছপালার ধরন-ধারণ ক্রমেই পালটে যাচ্ছে। মহারাষ্ট্রের পাহাড়গুলো সাধারণত একটু ন্যাড়াগোছের হয়। তার গাছপালাও হয় একটু বেঁটে-বেঁটে। কে জানে, রুক্ষ পাহাড় থেকে তেমন রস পায় না বলেই বোধহয় তারা মাথায় বিশেষ বাড়ে না। গাছপালার মধ্যে আতা আর কাঁটাগাছের ঝোপই বেশি। মাঝে-মাঝে শালগাছও চোখে পড়ে। তবে বেঁটে খর্বুটে জাতের শাল। রাধানগরীর খানিক আগে থেকেই কিন্তু নারকোল গাছ চোখে পড়তে শুরু করেছিল। এখন রাধানগরী ছাড়িয়ে এগোতে-এগোতে দেখলুম যে, নারকোল গাছের সংখ্যাও ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে।

গাইড বলল, "নোনা মাটি, নোনা হাওয়া, নারকোল তো এখানে হবেই।"

নোনা হাওয়া! শুনে আমার বুকের মধ্যে ধড়াস করে উঠল। তার মানে তো আমরা সমুদ্রের কাছে এসে পড়েছি।

গাইড বলল, "বিলক্ষণ। ওই যে সামনে একটা উঁচু পাহাড় দেখছেন, ওইটে ছাড়ালেই আমরা গোয়ায় গিয়ে ঢুকব।"

তা গোয়ায় গিয়ে যখন ঢুকলুম, ঘড়িতে তখন পাঁচটা বাজে। তক্ষুনি অবশ্য সমুদ্র চোখে পড়ল না; চোখে পড়ল আরও খানিকটা এগিয়ে। বাসের জানলা থেকেই দেখতে পেলুম, দিগন্ত অবধি শুধু নীল আর নীল। গাছপালার আড়ালে সেই নীল মাঝে-মাঝে হারিয়ে যাচ্ছে, আবার খানিক বাদেই ভেসে উঠছে আমাদের চোখের সামনে।

বিকেল ছটা নাগাদ পানাজির জাহাজঘাটার সামনে আমাদের বাস থামল। কিন্তু না, আজ শুধু পথের কথাই বললুম, গোয়ার কথা পরে বলব।

বাম্বির বন্ধু

সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

গল্পটা বাম্বির। কিন্তু এ-গল্পটায় বড়-টুম্পা, ছোট-টুম্পা আর বড়-টুম্পার আহ্লাদীকে বাদ দেওয়া যাবে না। আহ্লাদী একটা পাটকিলে রঙের কুকুর। তার ঠিকানা : উত্তরে রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, দক্ষিণে মেঘনাদ সাহা সরণি,পুবে হিন্দুস্থান পার্ক আর পশ্চিমে শরৎ চ্যাটার্জি পার্ক। এই সীমানার মধ্যে কেউ কিছু খেলেই আহ্লাদী টের পায় আর লেজ নাড়তে-নাড়তে এসে হাজির হয়। এখান দিয়ে যদি মিষ্টি কিনে নিয়ে যাও, তাহলে আহ্লাদী তোমার পিছু নেবেই। কেউ যদি জিলিপি খায়, তাহলে আহ্লাদী লাফিয়ে জিলিপির নাগাল পাবার চেষ্টা করবেই। বড়-টুম্পাকে তোমরা যদি না-চেনো, তাহলে কখনো যদি রোগা, লম্বা আর মিষ্টি দেখতে একটা মেয়েকে দ্যাখো কাপড়ের তৈরি কনডাকটদের ব্যাগ গলায় ঝুলিয়ে ঘুরছে আর একটা কুকুর তার কোমর সামনের দু পা দিয়ে জড়িয়ে পিছনের পা দিয়ে হেঁটে চলেছে, তাহলে বুঝবে বড়-টুম্পা আর আহ্লাদী চলেছে। আহ্লাদী জানে, বড়-টুম্পার ব্যাগে টফি লজেন্স আছে, তাই ওইভাবে তার আবদার জানাচ্ছে। আহ্লাদী বড়-টুম্পার দেওয়া লজেন্স খেয়েই শরীরের চেকনাই বজায় রেখেছে। মধ্যে কয়েকদিন বড়-টুম্পা একটু অসুস্থ হয়েছিল, বাড়ি থেকে বেরোনো বন্ধ ছিল, আর তারই ফলে আহ্লাদী তখন বেশ রোগা হয়ে গিয়েছিল। ছোট-টুম্পাকে সবাই বলেছে, ওর এখন একটু ব্যায়াম করা দরকার, তাই বিকেলবেলায় বড়-টুম্পা, ছোট-টুম্পা আর আহ্লাদীকে পার্কে দেখা যায়।

বিবেকানন্দ পার্কটা বিরাট। এ-ধারে দাঁড়ালে ও-ধারের লোককে চিনতে পারা যায় না। সুতরাং এখানে অনেকগুলো ফুটবল খেলা হয়। এতে মাঝে-মাঝে যে অসুবিধা হয় না, তা নয়। পাশের খেলা থেকে বলটা উড়ে এসে পড়ল এ-দিকের এক খেলোয়াড়ের পায়ে, সে বলটা পাঠিয়ে দিল বিপক্ষের জালে, তাহলে কি গোল হবে? এ নিয়ে খিটিমিটি বাধে। সেদিন যখন টুম্পারা পার্কে ঢুকল, তখন দারুণ এক খেলা শুরু হতে চলেছে। বাম্বির দল 'ককলার বুলেটস' খেলছে 'দুর্দান্ত একাদশ'-এর সঙ্গে।

দুর্দান্ত দলটা খুবই ভাল। দুদিন বাদেই পুজোর ছুটি। তারপর ফুটবল চলে গিয়ে ক্রিকেট আসবে। বাম্বি তার্পিন তেল মাখাতে শুরু করেছে তার ক্রিকেট ব্যাটে। এদিকে ভারী মুশকিল হয়েছে। গতকাল থেকে নণ্টুর ধুম জ্বর এসেছে। নণ্টুর গোলকীপিং এক দেখবার জিনিস। ওকে সবাই ভাস্কর আর শিবাজি মিলিয়ে ভাবাজি বলে। ও খেলতে না-পারলে ককলার বুলেট্স খুব বেকায়দায় পড়বে। তাছাড়া দুর্দান্তর ছেলেগুলো মহা দুষ্টু। তারা হেরে গেলে বলে রেফারী বেশি খেলিয়েছে কিংবা ও গোলটা অফসাইড ছিল, আর জিতলে বলবে, তাও তো মন দিয়ে খেলিনি। বাম্বি ঠিক করেছিল, আজ ওরা হাফটাইমের আগেই বেশ কয়েকটা গোল ঢুকিয়ে দেবে। কিন্তু এখন গোলে কে খেলে? কারুরই গোলে খেলার অভ্যাস নেই। ককলারের অতিরিক্ত খেলোয়াড়ও কেউ গোলে খেলে না। শেষমেশ ঠিক হল বাম্বিই গোলে খেলবে। খেলা শুরু হতে যাবে এমন সময় বড়-টুম্পা ছোট-টুম্পা ঢুকল খেলার মাঠে। আর আহ্লাদীও হঠাৎ বড়-টুম্পার কোমর ছেড়ে দৌড় লাগাল। কী হচ্ছে বোঝবার আগেই একটা ছোট্ট ইঁদুরের মতো প্রাণী বাম্বির গা বেয়ে উঠে বুক-পকেটের মধ্যে ঢুকে গেল। বাম্বি তো আরশোলা ইঁদুর টিকটিকি, সব পোষে। অবিশ্যি বাম্বির মা এত সব জানেন না। তাঁকে বলেও দরকার নেই। মা'রা একটু অদ্ভুত হন। কখনো ভীষণ ভালবাসেন, কখনো ভীষণ রেগে যান।

খেলা আরম্ভ হয়ে গেল প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। দুর্দান্তরা যখন দেখল বাম্বি গোলে, তখন ওরা ভাবল কেল্লা ফতে। যেখান-সেখান থেকে গোলে শট করতে শুরু করল। কিন্তু বাম্বির বলগুলো আটকাতে কোনো অসুবিধাই হল না। বলগুলো যেন ওর হাতের মধ্যেই আসতে ব্যস্ত। ককলাররা হাফটাইমের আগে একটা গোল দিল। হাফটাইমের পর দুর্দান্ত দলটা পুরো উঠে এল। ওরা মরিয়া, গোল শোধ দেবেই দেবে। ককলারদের ব্যাক হাফব্যাক হিমশিম খেতে লাগল। ফরোয়ার্ডরা নেমে এল। কিন্তু তবু নিস্তার নেই। ওদের ফরোয়ার্ড মুন্না ব্যাককে কাটিয়ে সোজা বাম্বির সামনে। নির্ঘাত গোল।

ফিরিস্তি নয়

বর্ষা ফুরোতেই সি, এম, ডি, এ-র মরশুম শুরু হলো। তাই মানুষ জনের চলাফেরার অসুবিধে এখন। চারপাশে রাস্তাঘাট কাটাছেঁড়া। তবে এই অসুবিধে হচ্ছে সাময়িক। কাজ শেষ করে বড় অসুবিধেগুলো দূর করার জন্যই এই ব্যবস্থা।

যেমন গার্ডেনরীচ জল প্রকল্প তৈরীর কাজ প্রায় শেষ। এখানকার জল যাতে বিভিন্ন মিউনিসিপ্যালিটিতে ও কলকাতায় আসে তার জন্য পাইপ বসানোর কাজও দ্রুত শেষ হচ্ছে। অকল্যাণ্ড স্কোয়ারে ভূগর্ভস্থ জলাধারটি সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারের জলাধারটি সম্পূর্ণপ্রায়। এগুলি থেকে যাতে চতুর্দিকে উচ্চচাপে জল পাঠানো যায় তার ব্যবস্থা তো এইবার করতেই হবে।

অন্যদিকে শিয়ালদা উড়ালপুলের কাজ শেষ হওয়ার মুখে। এখন সেখানে আলোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে উড়ালপুলের আলোর জন্য টেণ্ডার ডাকা হয়েছে। তাছাড়া রামমোহন সরণি, মহাত্মা গান্ধী রোডের সংযোগস্থল থেকে বিবেকানন্দ রোডের সংযোগস্থল পর্যন্ত চওড়া করা হবে। কলকাতার উপকণ্ঠে ইস্টার্ণ মেট্রোপলিটান বাইপাস আর ব্যারাকপুর কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ের অধিকাংশ কাজ আগামী বছর শেষ হবার কথা। ক্যানেল ইস্ট ও ক্যানেল ওয়েস্ট রোড আরও ভাল এবং আরও আলোকিত হবে। এছাড়া রাজপুর মিউনিসিপ্যালিটির প্রায় ২০টি রাস্তা, বেহালা মিউনিসিপ্যালিটির ১০টি রাস্তা, হুগলী ও ২৪ পরগণার কিছু কাজও। নালা নর্দমার ব্যাপারে কর্পোরেশনের ৩, ৫৯, ৬০ এবং ৬ নম্বর ওয়ার্ডে বহু কাজ চলছে।

সি, এম, ডি, এ-র কাজকর্ম সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করার জন্যই এসব জানালাম।

(জনসংযোগ বিভাগ, সি, এম, ডি, এ
৩এ অকল্যাণ্ড প্লেস, কলকাতা-১৭ থেকে প্রচারিত)

বাম্বি ভুলে গেছে সে গোলকীপার, সোজা ওর স্বভাবসিদ্ধভাবে এগিয়ে গিয়ে ট্যাকল্ করল, তারপর বডি সোয়ার্ভ করে বল নিয়ে বেরিয়ে এসে উঁচু করে বলটা দিয়ে দিল লেফট আউটে। দুর্দান্তরা এগিয়ে এসেছে সবাই, লেফট আউট সুযোগ বুঝে একজনকে কাটাতেই সোজা ফাঁকা মাঠ পেয়ে গেল। কিন্তু গোল হল না। অবিশ্বাস্যভাবে বল বাইরে মেরে দিল। খেলা শেষ হতে যখন কয়েক মিনিট বাকি, তখন ককলারের ব্যাক হ্যাণ্ডবল করল পেনালটি এরিয়ার মধ্যে। পেনালটি শট নেবে মুন্না। বাম্বির বুক কাঁপছে। মুন্না বল বসাল। মুন্না সর্বদা ডান দিকে বল মারে। বাম্বি ডানদিকে নজর রাখল, ঝাঁপিয়ে পড়ে শেষ চেষ্টা করবে। হঠাৎ কে যেন বলল : বাঁ দিক। তখন বাম্বির কোনো ধারণাই নেই কে বলছে, কিন্তু মুন্না সজোরে মারল বাঁ দিকেই। আর বাম্বি লাফিয়ে বলের ওপর পড়ল। মাঠে প্রচণ্ড হাততালি। খেলা শেষ। কিন্তু সবচেয়ে অবাক কাণ্ড ; দুর্দান্তর ক্যাপটেন এগিয়ে এসে বাম্বিকে বলল, "বাম্বি, তুই আজ দারুণ খেলেছিস্। তুই গোলে খেলিস না কে বলবে। নণ্টু থাকলে তোরা গোল খেতিসই। তাছাড়া তুই যে পাস দিয়েছিলি, তাতেও আমরা গোল খেতাম। নেহাত ভাগ্যের জোর।" ককলারের ছেলেরাও বলল, দুর্দান্তরা যে-রকম চেপে ধরেছিল, তাতে ওদের গোল হওয়া নিশ্চয় উচিত ছিল।

বাম্বি অবাক হয়ে শুনছিল। দুর্দান্তদের সঙ্গে খেলার পর প্রত্যেকবার বিশ্রীরকম হাতাহাতি হয়েছে। এভাবে তো কখনো শেষ হয়নি। আজ এসব কী হচ্ছে? কিন্তু কী আনন্দই না লাগল। ঝগড়া না করলে এত ভাল লাগে? এতক্ষণ ও নানা গোলমালে ভুলে ছিল ওর পকেটের প্রাণীটির কথা। এবার মনে পড়ল। পকেট থেকে সাবধানে বার করল সেই প্রাণীটিকে। কিন্তু এ তো ইঁদুর নয়। এ যেন ছোট্ট একটা নীল রঙের উলের বল। কিন্তু জীবন্ত। কাঁপছে ছোট্ট দেহটা। কিছুক্ষণ আগে যেমনভাবে কেউ ওকে 'বাঁ দিক' বলেছিল, সেইভাবেই কে যেন বলল, "শাবাশ বাম্বি।" কিন্তু কথাটা কেউ বলেনি, ওর মাথায় গিয়ে কথাটা লেগেছে। তবে কি ওই ছোট্ট প্রাণীটাই বলছে?

বাম্বি আরো অবাক হয়ে গেল বাড়িতে ফিরে। ও যখন বাড়িতে এসে পৌঁছল, তখন বাড়িতে মামমাম এসেছে। মামমাম বাম্বিকে খুব ভালবাসে। বাম্বিকে মা বললেন, "আমি মামমামকে নিয়ে বেরোচ্ছি, তুমি হাত মুখ ধুয়ে পড়তে বসবে। আজ মাস্টারমশায়ের সব কাজ শেষ করে রাখবে। আর তোমায় কতদিন বলেছি তোমার পড়ার টেবিল সাফ করে রাখতে। আজ টাস্ক শেষ করে বইয়ের টেবিল ঠিক করে রাখবে।"

মা বেরিয়ে যেতে সেই নীল বলটাকে সাবধানে বার করে বাম্বি একটা ছোট্ট কাগজের বাক্সে রাখল। প্রশ্ন করল, "এখানে তোমার কোনো অসুবিধা হবে না তো?" আবার মাথায় উত্তর এল, "না, হবে না।"

বাম্বি স্নানের ঘরে চলে গেল। সেখানে হাতমুখ ধুয়ে এসে রতনদার কাছে খাবার খেয়ে নিয়ে ঘরে ঢুকে বাম্বি অবাক। পড়ার টেবিলটা ঝকঝকে তকতকে করে সাজানো। শুধু বাম্বিরই নয়, দাদার টেবিলও পরিষ্কার। বাম্বি টেবিলে বসে টাস্ক শুরু করল। আজ বাম্বির চমকানোর দিন। অঙ্কগুলো একেবারে মিলে গেল। বাম্বির টাস্ক খুব তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেল। বাম্বি এবার বাক্সটা নিয়ে টেবিলে বসল। বাক্সটা খুলতেই আবার শুনতে পেল, "বাঃ, ভারী সুন্দর করে টেবিল পরিষ্কার করেছ তো!" তারপর একটু থেমে আবার : "তোমার জোরে কথা বলার দরকার নেই, আমি তোমার প্রশ্ন বুঝে নেব।"

বাম্বি মনে-মনে প্রশ্ন করল, "তুমি কী বা কে?"

উত্তর এল, "পরে জানবে।"

"তুমি আমার টেবিল পরিষ্কার করেছ? কী করে করলে?"

"আমাদের ক্ষমতা আছে, আমরা সব কাজ করতে পারি।"

"তাই যদি পারো, তবে আহ্লাদীকে দেখে আমার পকেটে ঢুকেছিলে কেন?"

"কারণ আহ্লাদীকে আমার আঘাত করতে ইচ্ছা করেনি।" তারপর বলল, "এখন তুমি পড়াশোনা করো, রাত্তিরে তোমার সঙ্গে কথা বলব।"

মা ফিরে এসে খুব খুশি। বাম্বি পড়াশোনা করছে, টেবিল সুন্দরভাবে সাজানো রয়েছে। দাদাও বাড়ি ফিরে খুব খুশি। বলল, "শুনলাম তুই নাকি আজ দারুণ গোলকীপিং করেছিস্।"

বাবা মা দাদা বাম্বি একসঙ্গে সবাই খেতে বসল। কত সুন্দর-সুন্দর গল্প হল। ভারী সুন্দর কাটল সমস্ত সন্ধ্যাটা। বাম্বি একবার গিয়ে নীল বলকে জিজ্ঞেস করে এল, "তোমায় কি খাবার দেব?" উত্তর এল, "আমার খাবার লাগে না। আমার খাবার আমি বাতাস থেকে সংগ্রহ করে নিতে পারি।" বাম্বির তর সইছিল না। রাত্তিরে জানতে হবে নীল বল কে। অন্য রাত্রে কে কখন ঘুমোয় খেয়াল থাকে না। আজ বাম্বি দেখল বাবার ঘুমোতে দেরি হচ্ছে। মা সারাক্ষণ ঘুটুর-ঘুটুর করে কাজ করছেন। রতনদারও কাজ যেন আর ফুরোচ্ছে না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঘুমিয়ে পড়ল সবাই। এবার সন্তর্পণে বাক্সটা খুলল বাম্বি। ও মা, এখন সেই তুলতুলে নীল বলটা থেকে আলো বেরোচ্ছে। নীল, স্নিগ্ধ আলো। এবার নীল বলটা বাক্স থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে এল। এসে বসল বাম্বির টেবিলের ওপর।

বাম্বি শুনতে পেল, "বাম্বি, তুমি খুব ভাল ছেলে। আমি অনেক দূরের থেকে আসছি। আমাদের আলোক-যানে তোমাদের এখানে আসতে তোমাদের হিসাবে আমাদের দশ বছর লেগেছে। তোমাদের গ্রহে যাকে গবেষক বলো, আমি তা-ই। আমরা বহু পুরনো সব লেখার মধ্যে হিংসা ঈর্ষা এইসব শব্দ পেয়েছি। কিন্তু আমরা জানি না ওগুলি কী ধরনের জিনিস। তাই আমি আজ দশ বছর গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছি ঈর্ষা আর হিংসা কাকে বলে দেখার জন্য। ব্যাপারটা আমি বুঝতে পেরেছি, কিন্তু কোনো উন্নত গ্রহে আমরা ঈর্ষা-হিংসার কোনো চিহ্ন দেখতে পাইনি। ফিরেই যাচ্ছিলাম, কিন্তু তোমাদের এই গ্রহে দেখলাম ঈর্ষা-হিংসা জাঁকিয়ে বসে আছে। আদিম গ্রহগুলোতে এইজন্য গবেষকদের দরকার হয়। তোমাদের গ্রহ আমি ঘুরে ঘুরে দেখেছি। অবাক কাণ্ড, এখানে তোমরা মারণাস্ত্র তৈরি করো; যাকে চেনো না, যাকে জানো না, যার বিরুদ্ধে তোমার কোনো অভিযোগ নেই, তাকে মারার জন্য। শুধু তৈরি করো না, জমিয়ে তোলো বিরাট অস্ত্রভাণ্ডার। কেউ কাউকে বিশ্বাস করো না, কেউ কাউকে ভালবাসো না। ভালবাসলে লোকে কাছে আসে, এটা তোমাদের গ্রহের লোকরা জানেই না যেন। আমাদের গ্রহেও নিশ্চয় এরকম ছিল একদিন। কিন্তু আজ নেই। আজ আমরা সবাইকে নিয়ে মিলেমিশে থাকি। আমাদের গ্রহের সূর্যর আয়ু শেষ হয়ে আসছে। আর কিছুদিন বাদেই সূর্যটা দাউ-দাউ করে জ্বলতে শুরু করবে, তারপর একদিন দারুণ শব্দ করে ফেটে যাবে। তার অনেক আগেই আমরা অন্য সূর্যের দেশে যাব। আমাদের গ্রহে এখন তাই দারুণ ব্যস্ততা। হিংসা ঈর্ষা থাকলে আমরা বাঁচতেই পারব না। তোমাদের শহরে এসেও আমি দেখেছি একই অবস্থা। একজন আরেকজনকে ঠেলে এগিয়ে যেতে চায়, এ ওকে ঠেলে বাসে উঠতে চায়। তোমাকে দেখে আমার মনে হয়েছিল যে, তুমি ওরকম নও। তাই তো তোমার পকেটে আশ্রয় নিলাম। আমার সঙ্গে আমার গ্রহের আবহাওয়া খানিকটা চলে এসেছে, তাই তোমাদের খেলায় কোনো গোলমাল হল না। আমি এখন চলে যাব। একটু পরেই আমাকে নিতে আসবে আমার গ্রহের লোকেরা।"

বলতে-বলতে বাম্বির পড়ার ঘরের জানলায় একেবারে নীল আলোর গাদি লেগে গেল। নীল বলেরা লাফালাফি করে ঘুরে বেড়াতে লাগল ঘরময়। সে কী রঙের বাহার। তারপর সবাই মিলে একসার হয়ে দাঁড়াল। বাম্বির বন্ধু আবার বাম্বির কাছে এগিয়ে এল, আর বলে গেল, "আমি চলে যাচ্ছি, কিন্তু তোমার মনে হিংসা আর ঈর্ষা আর কখনো ঢুকবে না। তুমি আমাদের গ্রহের বন্ধু হয়ে গেলে। আমরা ঈর্ষা করি না, হিংসা করি না, কিন্তু আমাদের কেউ ক্ষতিও করতে পারে না। তোমারও কোনো ক্ষতি কেউ করতে পারবে না, যতক্ষণ তুমি এই জামাটা পরে থাকবে।" বলার সঙ্গে-সঙ্গে নীল আলোগুলো মহানন্দে বাম্বির গায়ে উঠে নাচতে লাগল। তারপর আবার সার বেঁধে দাঁড়িয়ে টুকটুক করে একেকজনে আকাশ-পথে পাড়ি দিল। বাম্বি দৌড়ে এসে ঝুল-বারান্দায় দাঁড়াল। ততক্ষণে নীল আলোগুলো অনেক দূরে চলে গেছে। কয়েক মুহূর্ত বাদেই তারা আকাশে মিলিয়ে গেল।

বাম্বি এখন গোলেই খেলুক আর ক্রিকেটের মরসুমে উইকেট-কীপার হয়েই খেলুক, যেদিন তোমরা দেখবে যে, ও ডোরাকাটা শার্ট পরে খেলতে নেমেছে, সেদিন বুঝবে ওর দল জিতবেই। এ-খবরটা বাম্বি কাউকে বলেনি। এমন-কী মামমামকেও না। তোমরাও বোলো না।

বসু-বাড়ি

শিশিরকুমার বসু

(৪২)

শীতের দিন। তাড়াতাড়ি সন্ধ্যা হয়। সেই সকালে গাড়িটা সার্ভিসিংয়ে দিয়েছি। অন্ধকার হয়ে আসছে, কিন্তু গাড়ি গ্যারাজ থেকে ফেরত দিচ্ছে না। বাবার বড় গাড়ির ড্রাইভার সাম্‌সুদ্দিনকে অনেকক্ষণ পাঠিয়েছি। আমি আমার তিনতলার ঘর থেকে বারে বারে রাস্তার দিকে দেখছি আর ছটফট করছি। যদি গ্যারাজ থেকে বলে, আজ কাজ শেষ হবে না, গাড়ি কাল দেব, তাহলেই তো গেছি। এই সব নানা দুশ্চিন্তা। যাই হোক্, সব চিন্তা দূর করে দেরি হলেও গাড়ি ফিরল। আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। ততক্ষণে রাঙাকাকাবাবুর বাক্স গোছানো আমি সেরে ফেলেছি।

মাঝে-মাঝে দোতলায় গিয়ে উঁকিঝুঁকি মারছিলাম। বাবা কোর্ট থেকে ফিরে স্নান সেরে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। আশেপাশে বাড়ির লোকজন ঘোরাফেরা করছে। বাবার সঙ্গে দেখা করার ও কথা বলার প্রয়োজন অনুভব করছিলাম। সুবিধে না পেয়ে তিনতলায় ফিরে এসে কী ভাবে কী করা যায় চিন্তা করতে লাগলাম। খানিকটা পরে বাবার পায়ের আওয়াজ পেলাম। এগিয়ে দেখি বাবা ধীরভাবে ওপরে উঠে আসছেন। ছাদের আলোটা জ্বেলে দিতে বলে আমাকে নিয়ে ছাদে বেরিয়ে গেলেন। বাবার সঙ্গে এত ভাবগম্ভীর পরিবেশে কথাবার্তা এর আগে আমার আর কখনও হয়নি।

বাবাকে খুবই উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছিল। তাহলেও একটু মৃদু হেসে বললেন, "কী, ঠিক পারবে তো?" প্রথমত, এতটা গাড়ি চালাতে আমার কোনও অসুবিধা হবে কি না, গাড়ির কোনও গোলমাল হওয়ার আশঙ্কা আছে কি না ইত্যাদি জিজ্ঞেস করলেন। আমি খুব আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বললাম, "গাড়ি চালানোর দিক থেকে আমার কোনও অসুবিধা নেই, ওয়াণ্ডারার গাড়িটার ওপরও বেশ ভরসা করা যায়।"

বাবা মনে মনে যেন সারা পথটা একবার দেখে নিলেন, কোথায়-কোথায় বাধা পাবার বা ধরা পড়ার আশঙ্কা আছে, চিন্তা করতে লাগলেন। তারপর বললেন, রাঙাকাকাবাবু যতটা নিরুদ্বিগ্ন তিনি ততটা নন। যুদ্ধের সময়, পথে অনেক কড়া পাহারা পেরিয়ে আমাদের যেতে হবে। বিশেষ করে চন্দননগর পার হবার সময় আমাদের অসুবিধেয় পড়তে হবে বলে বাবার আশঙ্কা ছিল। চন্দননগর ছিল বিরাট ব্রিটিশ রাজত্বের মধ্যে একটি ফরাসি উপনিবেশ। একটা ছোট্ট মাপের অন্য রাজ্য বলা চলে। সেখানকার ফরাসি পুলিশ নানা জিনিসের, বিশেষ করে মাদক দ্রব্যের চোরাচালান ধরবার জন্য শুনেছি গাড়িঘোড়া আটক করত।

বাবা বললেন, এত রাত্রে একটা প্রাইভেট মোটরগাড়ি চন্দননগর দিয়ে কেন যাচ্ছে প্রহরীদের এ-রকম মনে হওয়া স্বাভাবিক। সে জন্য তিনি ওই এলাকা অতিক্রম করার সময় খুব সাবধান হতে বললেন।

বাবা আরও জানালেন যে, আমার হঠাৎ বারারি যাওয়ার একটা অজুহাত তৈরি রাখার ব্যাপারে রাঙাকাকাবাবুর সঙ্গে তাঁর কথা হয়েছে। দরকার হলে বলা হবে যে, আমার বৌদিদির অসুখের খবর পেয়ে বাবা আমাকে নিজের চোখে তাঁকে দেখে আসার জন্য পাঠিয়েছেন। আরও ঠিক হয়েছে যে, আমি বারারি পৌঁছে একটা টেলিগ্রাম পাঠাব। জানাব যে, বৌদিদি আগের চেয়ে ভাল আছেন। চিন্তার কোনও কারণ নেই। ছাদের আলোয় বাবা আমার সঙ্গে অল্প কিছুক্ষণ পায়চারি করলেন। বললেন, এই ধরনের গোপন কথাবার্তা খোলা আলোকিত জায়গায় হওয়াই ভাল, যাকে বলে 'কন্‌স্পিরেসি আণ্ডার দি ল্যাম্পপোস্ট'। তাতে লোকের মনে সন্দেহের উদ্রেক হয় না। তারপর আমার দিকে চেয়ে আবার একটু মৃদু হেসে

'আচ্ছা' বলে ধীরভাবে নীচে নেমে গেলেন। বুঝলাম, বাবাকে খুব চিন্তায় ফেলেছি।

পরে মা আমাকে বলেছিলেন যে, সেদিন বাবা রাত দুটো পর্যন্ত জেগে ছিলেন, এবং সামনে দিয়ে ওয়াণ্ডারার গাড়ি চলে যাওয়ার আওয়াজ শোনার জন্য কান পেতে ছিলেন এবং মাঝে-মাঝেই ঘরের পশ্চিমের ছোট বারান্দায় আনাগোনা করছিলেন। ভেবেছিলেন যে, উডবার্ন রোড দিয়েই সম্ভবত আমরা উত্তরে যাব।

ঘড়ির কাঁটাটা বেশ দ্রুত চলতে আরম্ভ করল। গাড়িতে মাল তুলব কী করে? কেউ যদি দেখে ফেলে কী বলব? প্রথমে নীচে নেমে গাড়িটা পরীক্ষা করতে লাগলাম, যেন সার্ভিসিং কেমন হয়েছে দেখছি। গাড়িটা সাম্‌সুদ্দিন গ্যারাজে তুলে রেখেছিল। বের করে একতলার খাবার ঘরের সংলগ্ন প্যানট্রির বা ছোট-রান্নাঘরের দরজার কাছাকাছি রাখলাম। সদর দরজা দিয়ে মাল নেওয়া যাবে না, লোক বসে আছে। তিনতলা থেকে তিন পর্যায়ে বাক্সদুটি নামালাম। প্রথমত, এদিক-ওদিক দেখে চট করে সেগুলি দোতলার ড্রয়িং-রুম বা বসবার ঘরে এনে রাখলাম।

ঘরটা অন্ধকার ছিল। দোতলায় চাকরবাকর তো আছেই । তাছাড়া, বিশেষ করে আমার বোন গীতার চোখ এড়িয়ে কাজটা করা চাই। পিঠোপিঠি ভাইবোনেদের সম্পর্কে একটা

মহানিষ্ক্রমণের আগে গাড়িটা ঠিক যেভাবে ছিল

বিশেষত্ব আছে। যত ভাব, তত ঝগড়া। একজন অন্যের কাছে কিছু লুকোলে বা একজনকে বাদ দিয়ে অন্যজন কিছু করলে, অভিমানের পালা শুরু হয়। কথা বন্ধ হয়ে যেতে পারে। তাছাড়া, বাড়ির সব ব্যাপারে গীতার দৃষ্টিও ছিল খুব সতর্ক। দ্বিতীয় পর্যায়ে দেখে এলাম দোতলা থেকে একতলার পথ ফাঁকা কি না। চট করে বাক্স দুটো একতলার খাবার ঘরে নিয়ে গেলাম। সৌভাগ্যক্রমে সেখানেও কেউ ছিল না, ঘরটাও ছিল অন্ধকার। শেষ পর্যায়ে গাড়ি-বারান্দা থেকে গ্যারাজের সামনে পর্যন্ত টহল দিলাম। সুবিধে বুঝে গাড়ির পেছনের একটা দরজা নিঃশব্দে খুলে রাখলাম। সময়মত বাক্সদুটো সীটের পিছনের জায়গায় ঢুকিয়ে ফেললাম।

কেউ তো কিছু দেখল না, কিন্তু আমার মনে হল, কোণে দাঁড়িয়ে বাবার গ্রাণ্ড ফাদার ক্লকটা যেন সব দেখল।

খাওয়াদাওয়াটা তাড়াতাড়ি সেরে ফেলতে হয়। আমাদের বহুদিনের পুরনো ঠাকুর সত্যবাদীর শরণাপন্ন হলাম। বললাম, বড়ই ক্লান্ত লাগছে, তাড়াতাড়ি খেয়ে শুয়ে পড়তে চাই। সত্যবাদী পাণ্ডা বহুদিনের লোক, এককালে মা-জননীর ঠাকুর ছিল। প্রায়ই সে আমাদের সঙ্গে অভিভাবকের মতো ব্যবহার করত। তখন ছোটরাও কেউ খায়নি, সত্যবাদী বলতে পারত, না, এখন হবে না, যাও। যাই হোক। মা কাছাকাছি থাকাতে কিছু বলল না। খাওয়ার সময় মা এসে পাশে বসে রইলেন।

বাবার ড্রাইভার সাম্‌সুদ্দিন ছিল বেশ বুদ্ধিমান ও কেতাদুরস্ত। সে বাড়িতেই থাকত, কিন্তু খেত বাইরে। ওয়াণ্ডারারের ড্রাইভার তো অসুস্থ মাকে দেখতে আগেই দেশে চলে গিয়েছে। কিন্তু সাম্‌সুদ্দিনকে সরানো দরকার। মাকে বললাম সামসুদ্দিনকে খেয়ে আসতে বলতে। এই ভাবে একটা-একটা করে পথের কাঁটা সরাতে হল।

নিজের খাওয়া সেরে মায়ের ঘরে গেলাম। পথের খরচের জন্য কিছু টাকা চাইলাম। আলমারি খুলে টাকা বের করতে করতে মা বললেন, "জানি না বাবা, তোমরা কী সব করতে যাচ্ছ!"

আমার নিজের পোশাকের কোনওরকম পরিবর্তন করতে রাঙাকাকাবাবু মানা

করেছিলেন—আমাকে তো দুই বাড়ির অনেকেই সেই সন্ধ্যায় দেখবে। ধুতি, শার্ট, গরম কোট, কাবলি জুতো। তবে নিজের জামাকাপড়ের ভেতর থেকে বের করে রাঙাকাকাবাবু নিজের একটা কাশ্মীরি টুপি আমাকে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, দিনের আলোতে গাড়ি চালাবার সময় টুপিটা পরে নিতে, যাতে চেহারাটা অন্যরকম দেখায়, অবাঙালি মনে হয়। ওই টুপিটা পরে রাঙাকাকাবাবুর ইউরোপে তোলা অনেক ছবি আছে। সঙ্গে নিজের জন্য জিনিসপত্র বিশেষ কিছুই নিইনি। ছোট্ট একটা ব্যাগই যথেষ্ট ছিল।

আটটা বেজে গিয়েছে। প্রস্তুত হয়ে ধীরে-সুস্থে নীচে নামলাম। গাড়ি-বারান্দায় একতলার বেয়ারা ধনু বসে ছিল। তাকে বললাম, আমি একটু রিষড়ার দিকে যাচ্ছি। যদি দেরি হয়ে যায় রাতটা ওখানেই থেকে যাব। এগারটা পর্যন্ত দেখে তোমরা দরজা বন্ধ করে দিও।

উলটো দিক দিয়ে যাত্রা শুরু করলাম। উডবার্ন পার্ক থেকে বেরিয়ে ডান দিকে চলে গেলাম। লোয়ার সার্কুলার রোড আর লী রোডের মোড়ের পেট্রল পাম্পে ঢুকলাম। ট্যাঙ্ক ভর্তি করে নিলাম, টিনে দু গ্যালন পেট্রল আলাদা করে নিলাম। টায়ারের চাপ ঠিক আছে কি না দেখে নিলাম। তারপর চৌরঙ্গি হয়ে পশ্চিম দিক থেকে এলগিন রোডে ঢুকলাম। বেশ স্বাভাবিক ভাবেই গাড়ি চালিয়ে ৩৮/২ এলগিন রোডে ঢুকে গেলাম। বাড়ির শেষ প্রান্তে গাড়িটা ঘুরিয়ে রান্নাবাড়ির সিঁড়ির কাছে রাখলাম।

রাঙাকাকাবাবুর ঘরে গিয়ে দেখি তিনি সিল্কের ধুতি-চাদর পরে উত্তরের জানালার কাছে মেজেতে পাতা আসনে বসতে যাচ্ছেন। সামনে থালায় খাবার দেওয়া রয়েছে। মা-জননী, বাড়ির দুই বৌ আর ছেলেমেয়েরা কয়েকজন রয়েছেন। বোঝাই গেল, 'নির্জনবাস ও ব্রত-টত করার যে সঙ্কল্প রাঙাকাকাবাবু প্রচার করেছিলেন, এই লোক-দেখানো অনুষ্ঠানটি ছিল তারই শুরু। ব্যাপারটা আমি দাদাভাইয়ের খাটে বসে নিশ্চল হয়ে দেখলাম। মাঝে-মাঝে রাঙাকাকাবাবুর সঙ্গে দৃষ্টি-বিনিময়ও হল।

(ক্রমশ)

ইডেনে ক্রিকেট

শাবাশ সুনীল গাভাসকার
দেখাও ব্যাটের চোস্ত মার।
সেঞ্চুরি চাই আর-কিছু,
এইখানে দাও তার কিছু।
চতুর্দিকে ব্যাট চালাও,
রানের বন্যা ছুটিয়ে দাও।

বিশ্বনাথও যায় না কম,
নিচ্ছে এখন একটু দম।
খানিক বাদে নামবে যেই,
তখন কারও রক্ষে নেই।
বলবে সবাই যুক্ত-হাত:
জয় বাবা, জয় বিশ্বনাথ।

কপিল-দোশি কোম্পানির
একটি দামাল, অন্য ধীর।
কিন্তু দুটিই ক্ষুধার্ত,
বল ছুঁড়ে তাই দু'ধার তো
কাঁপিয়ে ছাড়বে দুই জোয়ান।
ভিনদেশীরা কম্পমান।

সিসের আংটি

বিমল কর

আগে যা ঘটেছে : শিশিরের অদ্ভুত অসুখ। চোখের সামনে নানা আজগুবি ব্যাপার ঘটে। অচেনা লোক বলে, কাছে যা আছে, তা না-রাখাই ভাল। সেটা কি এই পুরনো আংটি? বাবুদা তাকে কৃষ্ণদয়ালের কাছে নিয়ে যায়। তিনি নানা অভিশপ্ত বস্তুর কথা শোনান। ভুয়ো টেলিগ্রামে পিসিমার অসুখের খবর পেয়ে শিশির হাজারিবাগে আসে। সেখানে আক্রান্ত হয়েও বেঁচে যায়। আলাপ হয় সিংহিবাবুর সঙ্গে। তিনি বলেন, "আমি তোমার শত্রু নই।" প্রয়াগ নামে যে-লোকটি শিশিরদের বাড়িতে কাজ করত, সে কি কোনো ওষুধ মেশাত তার খাবারে? ভবতোষ সান্যালের বাড়িতে টেলিগ্রাম-ফর্মের খোঁজ মেলে। সান্যালের বাসে উঠে দুর্ঘটনায় সিংহিবাবু জখম। তিনি জানান, সান্যাল শিশিরদেরই প্রতিশোধলিপ্সু আত্মীয়; তারই কথায় তিনি শিশিরকে পাগল করবার চেষ্টা করেছিলেন। চক্রান্ত ফাঁস হবার ভয়ে সান্যাল কি সিংহিবাবুকে খুন করতে চায়? শিশিরের বন্ধু বংশী বলে, লছুয়াকে সিংহিবাবুর বডিগার্ড করা হোক। তারপর···

॥ ২৯ ॥

বিকেলে বেড়াতে বেরোবার সময় শিশির আর বাবু আশালতাকে একটু ধোঁকা দিয়ে বেরিয়ে পড়ল। আশালতা ঠিক বুঝলেন না। শুধু বললেন, "কাঁধে থলি নিয়ে কোথায় যাচ্ছিস?"

শিশির একমুখ হেসে বলল, "কোথাও নয়। এই বাজারের দিক থেকে ঘুরে আসব। বংশীর জন্যে···" বলে শিশিরের আর কথা জুটল না মুখে; তারপর ফট্ করে বলল, "ওর জন্যে জামা-প্যান্ট আছে। এখানকার দরজিকে দেখাবে। কলকাতার ছাঁটে প্যান্ট-শার্ট করাবে কিনা তাই···!"

আশালতা অতশত বুঝলেন না। ভাইপোর কথাই বিশ্বাস করে নিলেন।

শশধর বোধহয় কাছাকাছি কোনো বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছেন, তাঁকে বারান্দায় বা বাগানে দেখা গেল না।

বাড়ির বাইরে এসে শিশির নিজের মনে হেসে উঠল। "বাবুদা, আর একটু হলেই ক্যাচ হয়ে যেতাম। ঝপ করে কি মিথ্যেকথা মুখে আসে, তাও পিসিমার সামনে?"

বাবু সবই বুঝতে পারছিল। তারও কম হাসি পায়নি।

মাঠ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বাবু মাথার ওপর তাকাল। মস্ত মস্ত নিম আর কাঁঠাল গাছের মাথায় ঝাপসা অন্ধকার জমতে শুরু করেছে। দল বেঁধে পাখিরা ফিরে আসছে এবার, তাদের কিচিরমিচির ডাকে জায়গাটা ভরে গিয়েছে; হাসপাতালের সামনে কারা যেন একটা ঘোড়া বেঁধে রেখেছে। ঘোড়াটা হঠাৎ ডাক ছাড়ল বিশ্রীভাবে।

বাবু কিছু ভাবছিল। বলল, "বংশী ভাল করল না মন্দ করল বুঝতে পারছি না।"

"কেন? খারাপ কী করেছে?"

"কী জানি! বেশি রিস্ক নেওয়া হচ্ছে।"

"রিস্ক নেওয়া হচ্ছে ঠিকই; কিন্তু বেশি বলছ কেন? আমরা ভবতোষকে একটা পালটা চমক দেব! তার বেশি কিছু নয়।"

বাবু প্যান্টের পকেটে হাত ঢোকাল। বলল, "ভবতোষ ভড়কি খাবার মতন লোক নয়।"

"দেখাই যাক।···তার আগে সিংহিবাবুকে তুমি ম্যানেজ করো। ভদ্রলোক সবই যেন বেঁকা চোখে দেখেন।"

"চল, দেখি।"

কথা বলতে বলতে শিশিররা সিংহিবাবুর বাড়ির কাছাকাছি চলে এল। দেখতে পেল সিংহিবাবুকে। বাড়ির সামনেই দাঁড়িয়ে আছেন।

কাছে এসে বাবু বলল, "আপনি এখনও বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন?"

"ভেতরে যাচ্ছিলাম, তোমাদের দেখতে পেয়ে দাঁড়ালাম। এখনও সন্ধে হয়নি।"

"হাতের ব্যথা কমল?" শিশির জিজ্ঞেস করল।

"সময় লাগবে। কালকের চেয়ে একটু কম।···চলো, ভেতরে যাবে তো?"

"না। বসব না।"

"যাবে কোথায়? বাজারে না স্টেশনে? যেখানেই যাও সাবধানে যাবে। আমি বরং বলি, তোমরা সন্ধের পর পথেঘাটে ঘুরো না।"

বাবু বলল, "আমরাও আপনাকে সেই কথাটা বলতে এসেছি। আপনি বিকেলের পর বাড়ির বাইরে একেবারেই থাকবেন না।"

সিংহিবাবু যেন তত অবাক হলেন না। 'কালকের কথা বলছ?"

"হ্যাঁ।" বাবু মাথা নাড়ল। "কাল কী হয়েছিল আপনি জানেন। কিন্তু আপনি আসল ব্যাপারটা জানেন না।"

সিংহিবাবু ঘাড় ঘুরিয়ে বাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন।

বাবু বলল, "কাল একটা লোক বর্শা হাতে আপনার বাড়ির পেছন দিকে ঘোরাঘুরি করছিল। তাকে ওইভাবে ঘোরাঘুরি করতে দেখে পুলিশের লোক তাড়া করে। ভেবেছিল ডাকাতদলের কেউ হবে। গুলি পুলিশ চালিয়েছিল। আপনি যে ভাবছিলেন ভবতোষের লোক চালিয়েছে তা নয়।"

সিংহিবাবু এবার অবাক হলেন। "কে বললে তোমাদের?"

বাবু সামান্য ইতস্তত করল। বলল, "আমরা সকালে বাজারে লোকের মুখে শুনেছি। লোকে অবশ্য আপনার বাড়ির কথা বলছে না, বলছে পুকুরের কাছে বর্শা-হাতে ডাকাতের কাউকে দেখা গিয়েছিল। ব্যাপারটা তো বুঝতেই পারছেন। লোকটা আপনার বাড়ির কাছেই ঘুরছিল।" বাবু কথা বলতে বলতে ঘাবড়ে যাচ্ছিল। কথা চেপে এর বেশি আর কী বলা যায়।

সিংহিবাবু বললেন, "তা পুলিশ এখানে কোত্থেকে এল?"

"এদিকে আজকাল প্লেন ড্রেসে পুলিশ ঘোরে। ডাকাতির পর থেকে।"

"ও!...তা আর কী শুনলে?"

"লোকটাকে ধরা যায়নি; পালিয়ে গিয়েছে।"

শিশির বলল, "আপনি ঠিকই ধরেছেন, ভবতোষের লোক আপনার দিকে নজর রেখেছে। তারা গুলি হয়তো চালায়নি, কিন্তু বর্শা-হাতে বাড়ির মধ্যে ঢোকার চেষ্টা তো করছিল। ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে একই কথা প্রায়। আপনি যে এখন ভবতোষের ভাড়াটে

মাথার চামড়া শুকিয়ে যাওয়া মানে আপনার চুলেরও দফারফার শুরু...

চুল ওঠার সমস্যার মূল কারণ রয়েছে মাথার চামড়াতে। সুতরাং মাথার ওপরের এই চামড়ার যদি ঠিকমত পুষ্টিসাধন না করেন তো, সেটি শুকিয়ে খস্‌খসে হয়ে অপুষ্ট হয়ে পড়বে। আর তার ফলে মাথায় খুস্‌কি হতে থাকবে, চুল চিরে-চিরে যাবে ও নিষ্প্রভ, নির্জীব হয়ে পড়বে...

আর সেই কারণেই আপনার দরকার বিশেষ ফর্মুলায় বানানো এমন এক হেয়ার টনিক যা মাথার এই চামড়া শুকিয়ে যাওয়া প্রতিরোধ করতে পারে।

HTM-PIL-2639-1

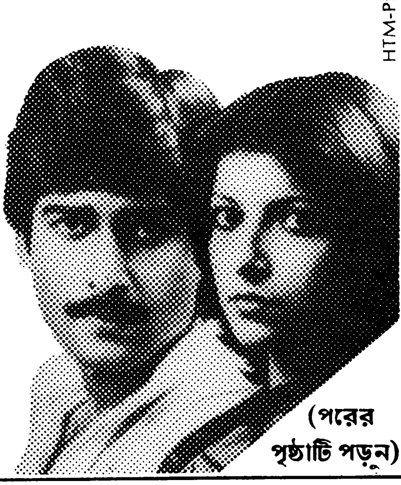

(পরের পৃষ্ঠাটি পড়ুন)

গুণ্ডা-বদমাশদের নজরে আছেন সব সময়—সেটা ঠিকই। নিজেই আপনি বলছিলেন। সত্যি আপনার জীবনের ক্ষতি হতে পারে। তাই বলছিলাম, যতটা পারেন সাবধানে থাকবেন।"

সিংহিবাবু কী যেন ভাবলেন। "সাবধানেই আছি।"

বাবু শিশিরের দিকে তাকিয়ে যেন পরামর্শ চাইছে এমনভাবে বলল, "একটা বিশ্বাসী কাউকে রাত্তিরে রাখা দরকার, তাই না শিশির?"

"রাখলে ভাল হয়," শিশির নিরীহের মতন বলল।

সিংহিবাবু দুজনের মুখ দেখলেন। বললেন, "না, কোনো লোক আমি রাখব না। কে বিশ্বাসী হবে আর কে হবে না কেউ বলতে পারে না। উটকো লোককে পয়সা খাওয়ালে সে যে অবিশ্বাসের কাজ করবে না—এর কোনো প্রমাণ আছে!"

শিশির হঠাৎ বলল, "আমরা কিন্তু একজনকে রাখব ভাবছি। আমাদের জন্যে। বিপদ তো আমাদেরও।"

সিংহিবাবু যেন বিরক্ত হলেন, "তোমাদের ব্যাপার তোমরা ভেবে দেখো। কাকে রাখছ? লোক ঠিক করেছ?"

"না, কালপরশু করব। পিসেমশাইকে বলেছি।"

"ও!"

শিশির আর দাঁড়াতে চাইল না। বাবুকে বলল, "চলো, বাবুদা।" বলে সিংহিবাবুর দিকে তাকাল। "আপনি ভেতরে যান।...ও, একটা কথা। ভবতোষের বাড়িতে কতরকম অস্ত্র আছে আপনি জানেন?"

সিংহিবাবু অবাক হয়ে বললেন, "কেন?"

"এমনি; জিজ্ঞেস করছি। বন্দুক তো আছেই।"

"বন্দুকের বেশি আছে। বন্দুকের নিশানা ভুল হতে পারে, তার কুকুরের হয় না। কুকুর তো নয়, একটা বাঘ।...এ-সব কথা জিজ্ঞেস করছ কেন?"

"এমনি। কৌতূহল। আপনি ভেতরে যান, আমরা একটু ঘুরে আসি।"

শিশিররা চলে যাচ্ছিল, সিংহিবাবু আচমকা বললেন, "একটা কথা তোমাদের বলে দিই। ভবতোষ বরাবরের শয়তান। তার সঙ্গে চালাকি করার চেষ্টা কোরো না। তোমরা ছেলেমানুষ। কতটুকু ক্ষমতা তোমাদের?"

শিশির বলল, "ক্ষমতা দিয়ে সব সময় লড়াই হয় না, বুদ্ধি দিয়েও হয়।"

আর দাঁড়াল না শিশিররা।

কয়েক পা এগিয়ে এসে বাবু বলল, "কেঁচে গেল রে! সিংহিকে ম্যানেজ করতে পারলাম না।"

শিশির বলল, "ওঁর এখন সব ব্যাপারেই সন্দেহ। আমাদেরও সন্দেহ করছেন কিনা কে জানে!"

এবার অন্ধকার হয়ে এসেছে। দুজনে পা চালিয়ে বংশীর দোকানের দিকে এগোল।

বংশী অপেক্ষাই করছিল।

শিশির দোকানে ঢুকেই বলল, "তোমার ফরমাশ-মতন জিনিস জোটাতে পারলাম না, বংশী।" বলে ব্যাগটা রাখল। "পিসিমার চোখ বাঁচাতে একটা প্যান্ট চাপা দিয়ে এনেছি।"

বংশী বলল, "কী কী পেয়েছ?"

একটা মরচে-ধরা ভোজালি, লোহার একটা আঁকশি, আর আধ শিশি স্পিরিট—স্টোভ ধরাবার।"

বংশী বলল, "ভোজালিটা রেখে দিয়ে যাও দোকানে, ধার করিয়ে নেব।"

বাবু বলল, "বংশী, ব্যাপারটা কিন্তু অনেক দূর গড়াতে পারে। ভেবে দেখেছ ভাল করে?"

মাথা হেলিয়ে বংশী বলল, "ভেবে দেখেছি। আমরা ভবতোষের সঙ্গে লড়তে যাচ্ছি না বাবুদা; ভদ্রলোককে একটু ঘাবড়ে দিতে যাচ্ছি।"

"তাতে লাভ?"

"একটা লোক যদি একতরফা লাঠি ঘোরায় তাকে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার আমাদেরও হাতে ইট-পাটকেল আছে।" বলে বংশী হাসল। "আপনি ভয় পাচ্ছেন কেন, ভবতোষকে আমরা শুধু জানান দিয়ে আসব যে তার বাড়ির ওপর আমাদেরও নজর আছে।" (ক্রমশ)

মার্ক টোয়েন বলেছিলেন, "দয়ার ভাষা এমনিই যে, বধিরও তা শুনতে পারে এবং অন্ধও সে-ভাষা পড়তে পারে।"

ব্যাটবলের খতিয়ান

ভারত-ইংল্যাণ্ডের মধ্যে টেস্ট-যুদ্ধ হয়েছে সাতান্নটি (বোম্বাইতে জুবিলী টেস্টের কথা আমরা এখানে ধরছি না)। এই সাতান্নটি টেস্টের মধ্যে ছাব্বিশটি টেস্টে ইংল্যাণ্ড বিজয়ী হয়েছে। সাতটি টেস্টে জিতেছে ভারত এবং বাকি চব্বিশটি টেস্ট অমীমাংসিত।

ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে ভারতের খেলোয়াড়রা এখনও অবধি (এ-সিরিজ শুরু হবার আগে) চৌত্রিশটি সেঞ্চুরি করেছেন। লালা অমরনাথ, আব্বাস আলি বেগ, ফারুখ ইঞ্জিনীয়ার, হনুমন্ত সিং, ভিনু মানকড়, মুস্তাক আলি, বাপু নাদকার্নি, দাতু ফাদকার ও দিলীপ বেঙ্গসরকারের ঝুলিতে আছে একটি করে শতরান। দুটি করে সেঞ্চুরি করেছেন বিজয় হাজারে, জয়সীমা, কুন্দরান, পঙ্কজ রায় ও বিশ্বনাথ। তিনটি করে শতরান করেছেন পাঁচজন — বিজয় মার্চেন্ট, পলি উম্রিগড়, বিজয় মঞ্জরেকার, মনসুর আলি খান পতৌদি ও সুনীল গাভাসকার।

ভারতের বিরুদ্ধে ইংল্যাণ্ডের খেলোয়াড়রা ছেচল্লিশটি সেঞ্চুরি করেছেন। এর মধ্যে টেড ডেক্সটার, জন এডরিচ, ইয়ান বোথাম, গডফ্রে ইভান্স, ডেভিড গাওয়ার, জো হার্ডস্টাক, রে ইলিংওয়ার্থ, ব্রায়ান লাকহার্স্ট, টনি লুইস, পিটার মে, পিটার পারফিট, বি নাইট, ডেভিড শেফার্ড, মাইক স্মিথ, বি এইচ ভ্যালেন্টাইন, জি এফ ওয়াল্টার্স, এ জে ওয়াটকিন্স, টি এস ওয়ার্দিংটন, ডেভিড লয়েড ও বেসিল ডি'অলিভেরার একটি করে শতরান রয়েছে। দুটি করে শতরান করেছেন অ্যামিস, ডেনেস, ফ্লেচার গ্রেভনি, হ্যামণ্ড, হাটন ও পুলার। তিনটি করে সেঞ্চুরি করেছেন চারজন — বয়কট, ব্যারিংটন, কাউড্রে ও টনি গ্রেগ।

ভারতের পক্ষে এক সিরিজে সর্বোচ্চ রানের কৃতিত্ব বিজয় মঞ্জরেকারের। '৬১-৬২ সালের সিরিজে তিনি ৫৮৬ রান সংগ্রহ করেছিলেন, যা এখনও ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে সিরিজে কোনো ভারতীয়ের ব্যক্তিগত সংগ্রহের রেকর্ড হয়ে রয়েছে। ইংল্যাণ্ডের পক্ষে রেকর্ডটি কেন ব্যারিংটনের দখলে রয়েছে। '৬১-৬২ সালের সিরিজেই ব্যারিংটন ব্যক্তিগতভাবে ৫৯৪ রান সংগ্রহ করেছিলেন। সিরিজে সবচেয়ে বেশি উইকেট নেবার কৃতিত্ব চন্দ্রশেখরের।

ব্যাটবয়

আর এটা হ'ল মাথার চামড়া শুকিয়ে যাওয়ার হাত থেকে বাঁচানোর উপায়...

ভেসলীন হেয়ার টনিক অ্যাণ্ড স্কাল্প কণ্ডিশনার অত্যন্ত খাঁটি ও পুষ্টিগুণে ভরপুর। এটি এমন তরল ও পাতলা যে কয়েক ফোঁটা মাথায় ছড়ালেই সরাসরি মাথার চামড়ার গভীরে প্রবেশ করে সারা মাথার চামড়ার পুষ্টিসাধন করবে।

ফলস্বরূপ : স্বাস্থ্যকর, পুষ্টিযুক্ত চামড়া...যা হ'ল স্বাস্থ্যোজ্জ্বল ঘন চুলের মূল আধার।

আরও কি, ভেসলীন হেয়ার টনিক অ্যাণ্ড স্কাল্প কণ্ডিশনার আপনার চুলকে রাখে চিকন ও পরিপাটি—সর্বদাই।

ভেসলীন®

হেয়ার টনিক অ্যাণ্ড স্কাল্প কণ্ডিশনার

প্রতিটি ফোঁটাই চামড়া শুকিয়ে যাওয়া প্রতিরোধ করে।

HTM-PIL-2639-2

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

সদাশিব

দৌড়োদৌড়ি কাণ্ড

চিত্রনাট্য : তরুণ মজুমদার
ছবি : বিমল দাশ

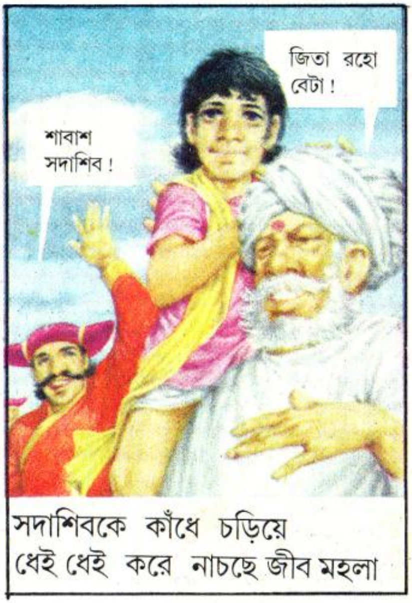

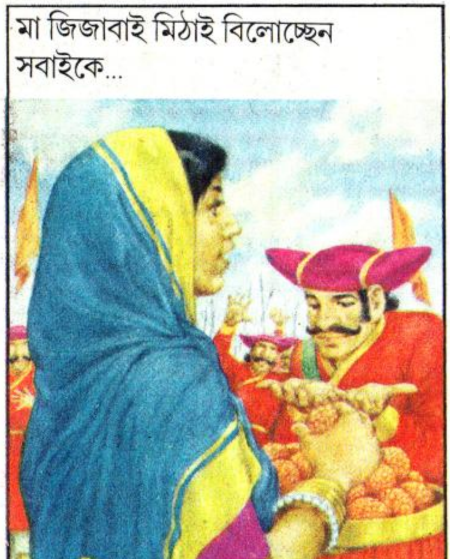

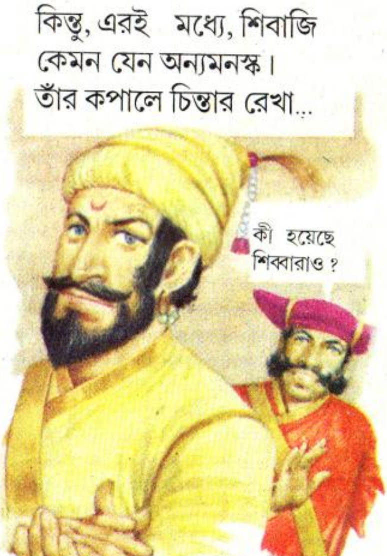

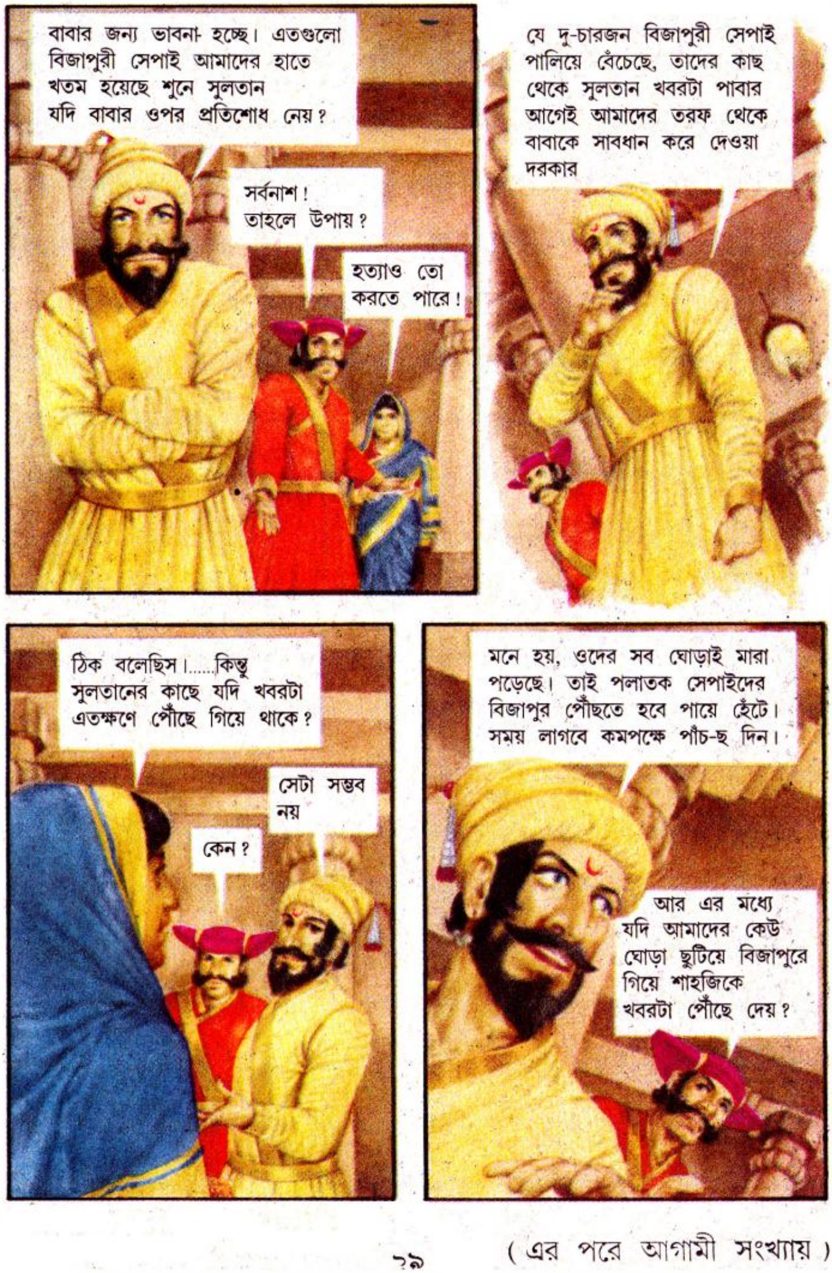

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

রোভার্সের রয়
দু কোটি টাকার প্রলোভন সত্ত্বেও বসরানের কোচ হয়নি রয়। স্ত্রী পেনি ইতিমধ্যে বসরান থেকে ফিরেছে। এদিকে লীগের একটা খেলাতেও জিততে পারেনি রোভার্স। অথচ বাড়ি ফিরে দেখে, দারুণ দামি গাড়ি তার অপেক্ষায়।
না না, কারও ভুল!
আমি এ-গাড়ির অর্ডার দিইনি।
তাহলে কোনো ভক্ত এটা আপনাকে উপহার দিয়েছেন।
একটা অটোগ্রাফ দিন!
ব্যাপার কী?
চটছ কেন? ওঁর কী দোষ?
বাড়িতে ঢুকছে রয়...
কথা হচ্ছে, এ-গাড়ি কে পাঠাল?
ডীলারকে জানিয়ে এক্ষুনি এ-গাড়ি ফেরত পাঠাব।
ভিতরে ঢুকতেই...
বসরান দূতাবাসের ফোন...
তাই বলো!
গাড়িটা আপনার পছন্দ হয়েছে তো?
তৌফিক! লণ্ডনে আপনি কী করছেন?
তৌফিক আবদুল্লা হচ্ছেন বসরানের ক্রীড়া-মন্ত্রী...
আপনার সঙ্গে যোগাযোগ রাখবার জন্যে আমি এখানে রাষ্ট্রদূত হয়ে এসেছি।
কিন্তু আমি তো এ-গাড়ি চাইনি!
গাড়িটা রাখুন। আর হ্যাঁ, কোচ আপনাকে হতেই হবে।
অসম্ভব! আমি যাব না! হ্যাল্লো! হ্যাল্লো!

রিপোর্টাররা কিছু টের পাবার আগেই গাড়িটা ফেরত পাঠাতে হবে!
টের ইতিমধ্যে পেয়েছে!
ফোটো তুলছে!
সর্বনাশ!
পরদিন...
খেলাধুলো
রয় কি বসরানের পথে?
দৈনিক ক্রীড়াবার্তা
রোভার্সের ম্যানেজারের জন্য বসরানের উপহার
ক্রীড়াজগৎ
তৌফিক বলছেন, এটা উপঢৌকন
গাড়ি নিয়ে খেলার মাঠেও জোর আলোড়ন...
বসরানের উপহার কোথায় রয়?
সে-গাড়ি বোধহয় পেনিকে দিয়েছে!
রয় বিরক্ত, ক্ষুব্ধ...
জেনে রাখো, ও-গাড়ি আমি চাইনি।
কাগজকে তা বললেই পারতে!
গাড়িটা ফেরতই বা দাওনি কেন?
গাড়িটা তারাই ফেরত নিয়ে যাবে!
ব্যস, ব্যস, তোমাকে বিশ্বাস করছি!
বিপক্ষ-দল সুযোগ নিচ্ছে রয়ের বিভ্রান্তির...
কবে বসরানে যাচ্ছ?
গাড়িটা কেমন হল, রয়?
নাঃ অসম্ভব!
এই অবস্থায় কি খেলা সম্ভব?
রয় ভুল বলেনি!
রোভার্স কিস্যু খেলতে পারছে না।
বিপদ দানা বাঁধছে
পরমুহূর্তে
রোভার্স গোল খেয়েছে!
দূর, দূর, রয় একেবারে যাচ্ছেতাই খেলছে!
মানসিকভাবে রয় বিপর্যস্ত, কী করবে সে?
এর পরে আগামী সংখ্যায়

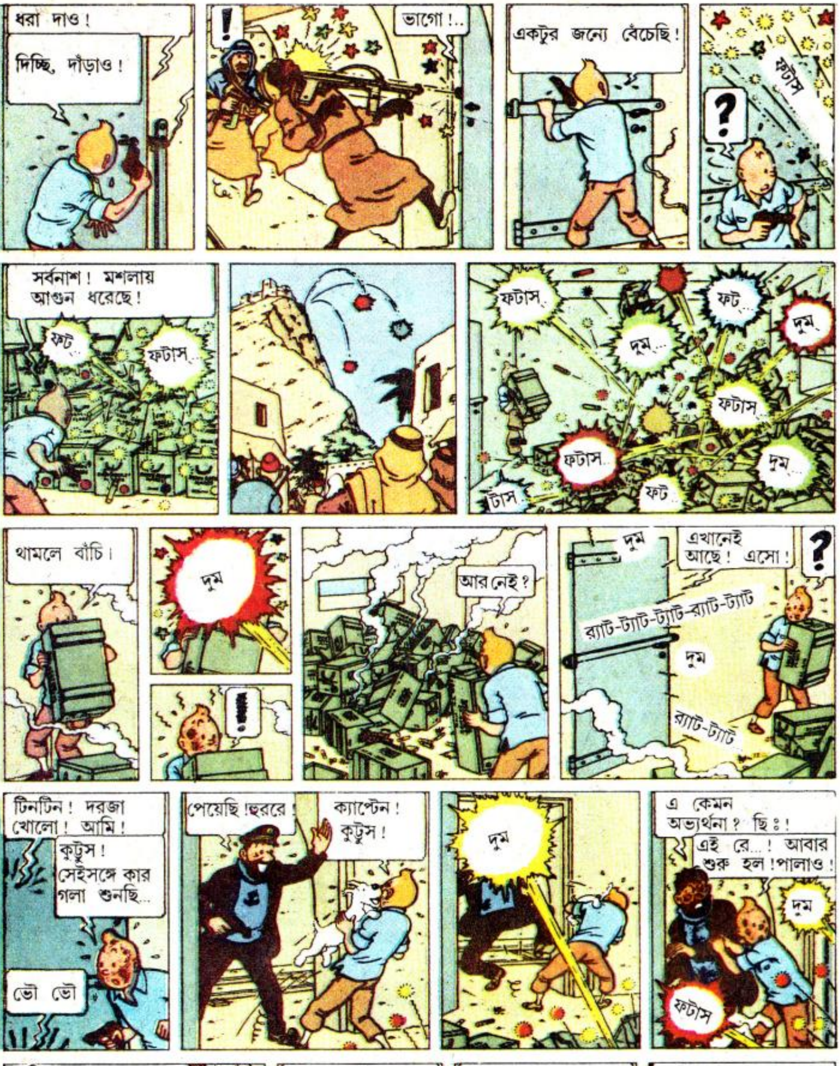
ধরা দাও!
দিচ্ছি, দাঁড়াও!
!
ভাগো!..
একটুর জন্যে বেঁচেছি!
?
ফটাস
সর্বনাশ! মশলায় আগুন ধরেছে!
ফট...
ফটাস...
ফটাস...
ফট...
দুম...
দুম...
ফটাস...
দুম...
ফটাস...
ফট...
টাস...
থামলে বাঁচি।
দুম
!
আর নেই?
দুম
এখানেই আছে! এসো!
?
র‍্যাট-ট্যাট-ট্যাট-র‍্যাট-ট্যাট
দুম
র‍্যাট-ট্যাট
টিনটিন! দরজা খোলো! আমি!
কুট্টুস! সেইসঙ্গে কার গলা শুনছি...
ভৌ ভৌ
পেয়েছি! হুররে!
ক্যাপ্টেন! কুট্টুস!
দুম
এ কেমন অভ্যর্থনা? ছিঃ!
এই রে...! আবার শুরু হল! পালাও!
দুম
ফটাস
পাজিগুলো ধরা পড়েছে! কিন্তু ক্যাপ্টেন, তুমি এখানে কী করে এলে?
কীভাবে এলুম? তাহলে শোনো...
কিন্তু আমিরের ছেলের খোঁজ মিলেছে তো?
কই, তাকে তো দেখিনি!
সর্বনাশ! এসো শিগগির!
আমির কি এসেছেন?
হ্যাঁ তিনি অপেক্ষা করছেন!

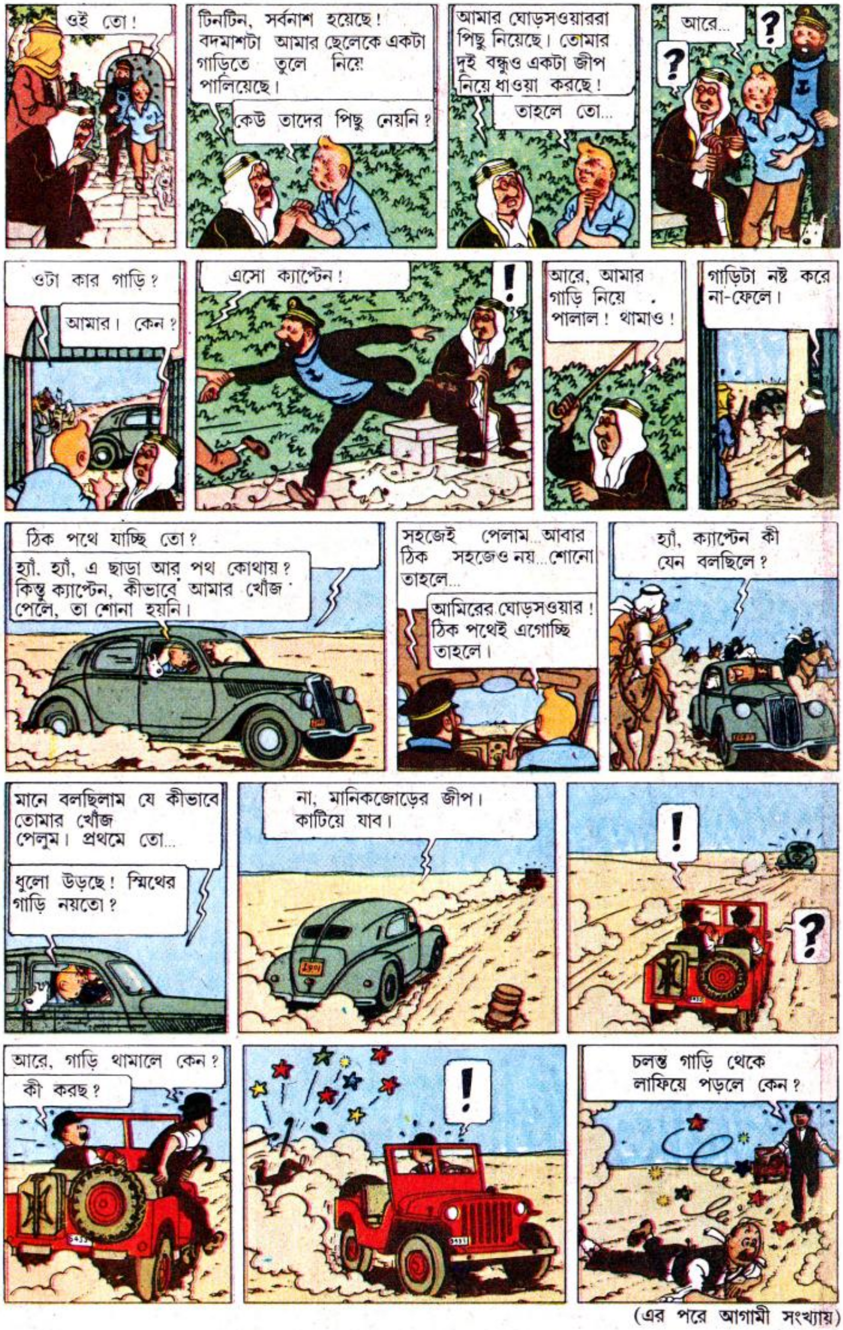

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

শব্দ-সন্ধান

১		২	■	৩		৪
	■		■		■	
■	৫		৬		৭	■
■		■		■		■
৮		■		■	৯	১০
	■	১১		১২	■	
১৩			■	১৪		

সংকেত: পাশাপাশি: (১) পাহাড়িয়া যে-জায়গাটি ম্যালেরিয়ার যম। (৩) রাজমিস্ত্রির যন্ত্র। (৫) তাসের নাম। (৮) চোখই শুধু মালিক নয়, আরো অনেক অর্থ হয়। (৯) কদম। (১১) কথায় বলে, একাই সাত রাজার ধন। (১৩) বি-বর্ণ হলে রান্নাঘরে কাকে পাওয়া যায়? (১৪) মালা।

উপর-নীচ: (১) পতঙ্গবিশেষ। (২) দুষ্টের দমন। (৩) চুলের ছদ্মবেশ আনে। (৪) পাথরবিশেষ। (৫) গুহাচিত্রের জন্য বিখ্যাত। (৬) দ্বীপান্তরদণ্ড। (৭) দুধের সারাংশ। (৮) তালু থেকে উচ্চারিত। (১০) ফাটলেই আওয়াজ। (১১) যে-গাছের পাতা ছাতার কাজ করে। (১২) যদি থাকে লেখায়, একটু থামতে শেখায়।

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যার সমাধান

র	শি	■	গো	■	হা	মা
বি	ল	■	রি	■	জি	ন
ন	■	পা	লা	ম	■	স
স	ঙ	■	■	■	শ্বা	স
ন	■	ম্যা	জি	ক	■	রো
ক্রু	শ	■	ঞ্জি	■	ডা	ব
শো	লা	■	র	■	হা	র

ধাঁধা

কাঁধের ঝোলা ব্যাগটা খাটের ওপর রেখে ছোট্‌কা সবে জামাটা ছেড়েছে, এমন সময় ঘরে ঢুকেছি আমি।

হাতে ধাঁধার খাতা আর ডটপেন। ছোট্‌কা আমাকে দেখে ভুরুটা শুধু একবার কুঁচকে কী যেন ভেবে নিল। তারপর বলল, "দাঁড়া, হিসেবটা একবার মিলিয়ে নিই।" বলে ব্যাগের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল হাত।

ব্যাগ থেকে প্রথমে বেরুল একটা দাড়ি কামাবার ক্রীম। সেটা টেবিলে রেখে ছোট্‌কা বলল, "যা নিয়ে গিয়েছিলাম তার অর্ধেক শুধু এটারই দাম। শুনছ তো সতুবাবু?"

শুনেছি তো বটেই, কিন্তু শুনে কী করব, সেটা আমার মাথায় ঢুকল না। পাঁচ ভাগের এক ভাগ। শুনে যাচ্ছ তো সতুবাবু?"

দেখা যাক কোন্‌ দিকে এগোয় ব্যাপারটা, এই ভেবে আমি শুধু ঘাড়টা একবার কাত করে জানালাম, শুনে যাচ্ছি। ছোট্‌কা বলল, "খাতার দামও মিটিয়ে দিয়ে যা রইল তার ছ' ভাগের এক ভাগ দিয়ে কিনেছি রিফিল দুটো।" ব্যাগ থেকে ডটপেনের দুটো লাল রিফিল বার করে ছোটকা রাখল টেবিলে। তারপর ছেড়ে-ফেলা জামার বুকপকেট থেকে বার করল চারটে টাকা। টাকা চারটে আমার দিকে দেখিয়ে ছোট্‌কা বলল, "চার টাকা ফিরেছে। এবার বলো তো সতুবাবু, ক'টাকা নিয়ে আমি দোকানে

ছোট্‌কা বলল, "মন দিয়ে শোনো।" বলতে-বলতে ব্যাগ থেকে বার করল একটা ব্লেডের প্যাকেট, সেটা হাতে করে ঘুরিয়ে দেখতে-দেখতে ছোটকা বলল, "বাকি টাকা যা রইল তার চার ভাগের এক ভাগ পড়ল ব্লেডের দাম। বুঝলে সতুবাবু।"

আমি তখনও বুঝিনি। ছোটকা ইতিমধ্যে ব্লেডের প্যাকেটটাও টেবিলে রেখেছে, ব্যাগ থেকে ফের বার করেছে একটা লম্বা খাতা, রুলটানা লেখার খাতা, সেটাও টেবিলে রাখল, তারপর বলল, ব্লেডের দামও মিটিয়ে দেবার পর যা বাকি রইল এই খাতাটার দাম তার গিয়েছিলাম?"

আমি চুপ। ছোট্‌কা বলল, "ভেবেই বলো না-হয়।"

এটাই এবারের প্রথম ধাঁধা।

দ্বিতীয় ধাঁধা ॥ এমন একটা ইংরেজি শব্দ বলতে পারো, যে-শব্দে ইংরেজি পাঁচটা ভাওয়েলই নির্দিষ্ট ক্রম-অনুযায়ী রয়েছে?

তৃতীয় ধাঁধা ॥ পল আর বিপল-এর তফাত কী?

গতবারের উত্তর ॥ (১) লেখা ছিল '86', উলটে পড়েছি '98', তাই এত গোলমাল। (২) 1961 (৩) টানাহেঁচড়া।

সত্যসন্ধ

কিসের ফোটো

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যায় ছিল কেটলির হাতলের ফোটো

ফোটো : তপন দাশ

উত্তর বটে

প্রঃ কী এমন জিনিস যা আপনি দেখতে পান না কিন্তু আমি পাই ?

উঃ আমার মাথার পেছনটা।

প্রঃ আপনি যে পদ্ধতিতে চাষ করছেন, তাতে এই গাছগুলো থেকে দু-কেজি বেগুনও পাবেন না, তা জানেন কি ?

উঃ জানি, কারণ এগুলো ঢেঁড়স গাছ।

প্রঃ কোন জিনিস যত ঘন হবে, তত কম দেখতে পাবেন ?

উঃ অন্ধকার।

প্রঃ অত বড় মাছের টানে আপনি ছিপসুদ্ধ জলে পড়ে গেলেন, নিশ্চয় ভিজে একশা হয়ে গিয়েছিলেন ?

উঃ না না, পড়লাম তো মাছের পিঠের ওপর।

সুসেন

মজার খেলা

টেবিলের ওপর একটা ব্যবহার করা ছোট্ট পেনসিল রেখে দাও। আর পকেটে রাখো একটা বড় নতুন পেনসিল। ব্যস, এবারের মজার খেলার জন্য এটুকুই মাত্র প্রস্তুতি। এবার দরকার একজন বন্ধু, যাকে নিয়ে মজা করবে।

বন্ধু তো আছেই ? তাই না ? সুতরাং বন্ধুকে ডেকে বুঝিয়ে দাও, তাকে কী করতে হবে।

টেবিলের ওপর রাখা পেনসিলটা তাকে দেখিয়ে বলো, "এই পেনসিলটাকে তোমাকে ছোট করে দিতে হবে, কিন্তু ব্লেড বা ছুরি দিয়ে কাটতে পারবে না, এমন-কী হাত দিয়েই ছুঁতে পারবে না পেনসিলটাকে। তবু ছোট করতে হবে, পারবে ?"

এমন অদ্ভুত শর্ত শুনে বন্ধু হতবাক হয়ে পড়বে। হাত দিয়ে না ছুঁয়ে, ব্লেড বা ছুরি দিয়ে না কেটে আবার ছোট করা যায় নাকি ? সে তোমাকেই চ্যালেঞ্জ করবে, "এ হয় না, অসম্ভব ব্যাপার।"

এবার তোমার পালা। তুমি কী করবে বলো তো ? পকেট থেকে বড় পেনসিলটা বার করে ছোট পেনসিলটার পাশে রেখে দাও—এবার বলো, "কী, ছোট হল কি না ?" দেখবে, এমন মজার কথায় বন্ধু কেমন বোকা বনে যাবে।

মজারু

হাসিখুশি

সেলুনে চুল কাটার পর এক ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন, "কত ?" সেলুনের মালিক বললেন, "আড়াই টাকা।" "সে কী মশায় ? গতমাসে বর্ধমানে চুল কাটলুম, মাত্র এক টাকা নিল।" সেলুনের মালিক মোলায়েম হেসে বললেন, "স্যার, বর্ধমানের যাতায়াত খরচটা ধরবেন না ?"

দুজন মহিলা জীবনে প্রথমবার বিমানে উঠে বিমানচালকের কাছে গিয়ে বললেন, "দেখুন, শব্দের গতির চেয়ে তাড়াতাড়ি চালাবেন না।" বিমানচালক অবাক হয়ে বললেন, "কেন ?" তাঁরা বললেন, "না, এই আমরা দুজনে একটু গল্পগুজব করতে করতে যাব, কথাবার্তা যাতে শুনতে পাই সেই জন্যে বলছি।"

অপারেশন টেবিলে রোগী বললেন, "ডাক্তারবাবু, এই আমার জীবনে প্রথম অপারেশন, আমার খুব ভয় করছে।" ডাক্তারবাবু মৃদু হেসে অভয় দিলেন, "ভয় পাবেন না, এটা আমারও জীবনের প্রথম অপারেশন।"

মাস্টারমশাই ক্লাসে উত্তরের খাতা দেখতে দেখতে রমেশকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার খাতায় এত উদ্ধৃতি-চিহ্ন কেন ?" রমেশ একটু ইতস্তত করে বলল, "স্যার, আমি দীনেশের খাতা দেখে টুকছিলাম, তাই ঐ কোটেশন-চিহ্নগুলো দিয়েছি।"

ছবি অহিভূষণ মালিক

প্লাস্টিক-যুগ

আশিস দেবরায়

ববি কাকুর সঙ্গে বাজার থেকে অনেক জিনিস কিনে নিয়ে এল। তার মধ্যে আছে প্লাস্টিকের বালতি, মগ, সাবানের কেস, জল রাখার জাগ, নুন রাখার কৌটো, খাবারের থালা—আরও কত কী! কাকু নতুন বাড়ি ভাড়া করে শিগগিরই সেখানে যাবেন—তাই এত সব জিনিস কেনা। বাড়িতে এসে জিনিসগুলো গুছিয়ে রাখতে গিয়ে ববি কাকুকে বলল, "কাকু দেখ, তুমি এতগুলি জিনিস কিনলে, এর প্রায় সবই কিন্তু প্লাস্টিকের। প্লাস্টিকের জিনিস দেখছি আমাদের বেশ কাজে লাগে—তাই না?"

কাকু উত্তর দিলেন, "আমরা তো প্লাস্টিকের মাত্র কয়েকটা জিনিস কিনেছি। প্লাস্টিক দিয়ে আরও বহু রকমের জিনিস এখন তৈরি হচ্ছে। যেমন টুথব্রাশ, রেডিওর বাক্স, বলপেন, শিশিবোতল ও তাদের ছিপি, সুতো, চেয়ার-টেবিল বানানোর বেত বা দড়ির সঙ্গে নানা প্রকারের বাক্স, জিনিসপত্র নেওয়ার ব্যাগ, পর্দার কাপড়, টেবিলের ঢাকনা, চিরুনি, ইলেকট্রিকের সামগ্রী—সবই তো প্লাস্টিকের। এমনকি **ফ্লাস্ক,** ইনজেকশন দেওয়ার সিরিঞ্জ পর্যন্ত প্লাস্টিকে তৈরি করা হচ্ছে। এছাড়া প্লাস্টিকে তৈরি কাগজে কত কী জিনিস যে প্যাকিং বা মোড়া হয়, তার হিসেব নেই—যেমন কাপড়, জামাপ্যাণ্ট, খাব জিনিস, গুঁড়ো সাবান, মশলা জাতীয় দ্রব্যা দুধ, জুতো, মোজা ইত্যাদি। এক কথায় ব যায়, আমরা সকালে ঘুম থেকে ওঠার প থেকে রাত্রে ঘুমোতে যাওয়া পর্যন্ত ব প্লাস্টিকের নানারকম জিনিস ব্যবহার করছি আধুনিক সমাজে প্লাস্টিকের অবদান প্রচু চাষ-আবাদেও প্লাস্টিক আজকাল খুব গুরুত্বপ ভূমিকা নিচ্ছে।"

ববি জিজ্ঞেস করল, "কাকু, প্লাস্টিক রবারের মতো গাছের আঠা থেকে তৈরি হয়

ববির আগ্রহ দেখে খুশি হয়ে কাকু বোঝা আরম্ভ করলেন, "না, রবারের মতো প্লাস্টি গাছের আঠা থেকে আসে না। প্লাস্টি রাসায়নিক পদ্ধতিতে কারখানায় তৈরি ক হয়। প্রায় ১২০ বছর আগে প্রথম প্লাস্টি

তৈরি হয়েছিল কাপড়ের তুলো থেকে পাওয়া সেলুলস নাইট্রেটের সঙ্গে কর্পূরের সংমিশ্রণে—এই প্লাস্টিকের আর এক নাম সেলুলয়েড। তবে ইংল্যাণ্ডের বিজ্ঞানীরা প্রথমে পলিইথিলিন নামে প্লাস্টিক তৈরি করলেন ১৯৩৩ সালে। আজকের বাজারে পাওয়া বেশির ভাগ প্লাস্টিকের জিনিসই কিন্তু এই পলিইথিলিন থেকে তৈরি। পলিইথিলিন থেকে প্লাস্টিক জাতীয় দ্রব্যাদি তৈরির উজ্জ্বল সম্ভাবনার আভাস পেয়ে, ১৯৩৮ সালে ইংল্যাণ্ডে প্রথম প্লাস্টিক তৈরির কারখানা গড়ে ওঠে। যুদ্ধের সময় এই কারখানায় রাডারের তার বা কেবল্ তৈরি করা হ'ত। এরপর আমেরিকায় ১৯৪৩ সালে প্লাস্টিকের প্রথম কারখানা স্থাপিত হয়। ক্রমশ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্লাস্টিকের বহু কারখানা ছড়িয়ে পড়েছে। ভেবে দ্যাখো,১৯৩৩ সালে যে প্লাস্টিক ইংল্যাণ্ডে মাত্র কয়েক গ্রাম তৈরি হয়েছিল, সেই প্লাস্টিকই ১৯৮০ সালে পৃথিবীর সব দেশ মিলিয়ে আনুমানিক ১ কোটি ৫০ লক্ষ টন তৈরি হয়েছে। এর থেকেই বোঝা যায় প্লাস্টিক কত বেশি পরিমাণে আজকাল ব্যবহৃত হয়।"

ববি বেশ অবাক হয়ে প্রশ্ন করল, "বিজ্ঞানীরা পলিইথিলিন কী ভাবে তৈরি করলেন?"

কাকু বললেন, "ইথিলিন নামে একটা গ্যাস ল্যাবরেটরিতে বানানো যায়। এই গ্যাসের অণুগুলি যথেষ্ট চাপ ও তাপের ফলে নিজেদের মধ্যে সংযোজন হয়ে (ইংরেজিতে যাকে পলিমেরাইজেশন বলা হয়) মোমজাতীয় এক পদার্থে পরিণত হয় এবং এই মোমজাতীয় পদার্থই পলিইথিলিন জাতীয় প্লাস্টিক। আজকাল ইথিলিন বেশির ভাগই পেট্রোলিয়াম থেকে প্রাপ্ত ন্যাপথা থেকে তৈরি করা হয়—এই প্রথায় ইথিলিন সহজে ও কম খরচে পাওয়া যায়।"

"কাকু, সব প্লাস্টিকই কি ইথিলিন থেকে তৈরি হয়?"

"সব প্লাস্টিক ইথিলিন থেকে তৈরি হয় না—তবে এ কথা বলতে হবে যে, ইথিলিন থেকে তৈরি প্লাস্টিকই অধিক ব্যবহৃত হয়। ইথিলিনজাতীয় অনেক রাসায়নিক বস্তুকে 'পলিমেরাইজ' করে নানান ধরনের প্লাস্টিক পাওয়া যায়। যেমন 'প্রপিলিন' নামে রাসায়নিক পদার্থকে প্রায় একইভাবে 'পলিপ্রপিলিন' নামে এক ভিন্ন প্লাস্টিকে পরিণত করা যায়। এই 'পলিপ্রপিলিন' প্লাস্টিক দিয়ে অনেক বেশি শক্ত ও মজবুত জিনিসপত্র তৈরি হয়।"

"এই পলিপ্রপিলিনও কি প্রথমে ইংল্যাণ্ডে তৈরি হয়?"

কাকু বললেন, "খুব ভাল প্রশ্ন করেছ। ইংল্যাণ্ডে পলিইথিলিন তৈরির পরই পৃথিবীর অনেক উন্নত দেশে ভিন্ন রকমের প্লাস্টিক তৈরির আগ্রহ দেখা দিল। তবে প্রথম পলিপ্রপিলিন তৈরি করল ইংল্যাণ্ড নয়, ১৯৫৪ সালে ইতালির বিজ্ঞানীরা। ১৯৫৭ সালে ইতালির এক বড় সংস্থা ব্যাপকভাবে পলিপ্রপিলিন তৈরির জন্যে কারখানা বসিয়ে

ফেলল। এর কিছু পরেই ১৯৫৮ সালে আমেরিকায় ও ১৯৬০ সালে ইংল্যাণ্ডে পলিপ্রপিলিন তৈরির কারখানা এসে গেল। ১৯৫৮ সালে মাত্র ২,০০০ টন পলিপ্রপিলিন তৈরি হয়েছিল আর ১৯৮১ সালে সারা পৃথিবীতে ৬০ লক্ষ টন পলিপ্রপিলিন তৈরি হওয়ার কথা।"

ববির জানবার উৎসাহ বাড়ছিল, তাই জিজ্ঞেস করল, "কাকু, আমাদের দেশে কবে প্লাস্টিক তৈরি শুরু হয়?"

কাকু বললেন, "আমাদের দেশে পলিইথিলিন তৈরির কারখানা প্রথম স্থাপিত হয় ১৯৫৯ সালে। তবে পলিপ্রপিলিন তৈরির

প্রথম কারখানা এল অনেক পরে—এই সেদিন ১৯৭৮ সালে গুজরাটে। এখন আমাদের ইথিলিন ও প্রপিলিন দুই-ই ন্যাপথা থেকে সংগ্রহ করা যায়, তাই পেট্রোলিয়ামের দাম বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই দুই রাসায়নিক পদার্থ তৈরি করার খরচও প্রচুর বাড়ছে। তবে পৃথিবীর বহু দেশে এই দুটি বস্তুকে অন্য উপায়ে শস্তায় বানাবার চেষ্টা চলছে।"

ববি বলল, "তার মানে, যে-দেশে যত বেশি পরিমাণে পেট্রোলিয়াম পাওয়া যাবে, সেখানে প্লাস্টিক তৈরিরও তত বেশি সুযোগ হবে।"

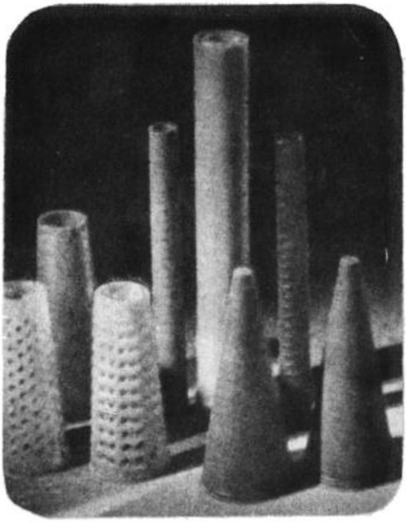

কাকু মাথা নেড়ে বললেন, "ঠিক বলেছ। আমাদের দেশে বোম্বে হাইতে পেট্রোলিয়াম পাওয়া গেলে শুধু যে পেট্রোলের সমস্যার কিছুটা সুরাহা হবে তা নয়, এর ফলে প্লাস্টিক শিল্পও বেড়ে উঠবে। কিন্তু আমাদের দেশে প্রচুর পেট্রোলিয়াম আমদানি করতে হচ্ছে—তাই প্লাস্টিক-শিল্পের কাঁচামাল যোগাড়ের ব্যাপারে আমাদের এখনও বিদেশের ওপর নির্ভর করতে হয়। অথচ প্লাস্টিক-শিল্প যে শুধু বহুরকম প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র শস্তা দামে তৈরি করতে সাহায্য করছে তা নয়, এর ফলে এমন বহু রকমের কাঁচামাল (যেমন নানারকম ধাতু, কাঠ, কাঁচ ইত্যাদি) সঞ্চয় করা যাচ্ছে, যেগুলিকে অন্য কাজে লাগানো যায়। প্লাস্টিক-শিল্পের প্রসারের সঙ্গে অনেক লোকের চাকরিরও সংস্থান হচ্ছে।"

ববিকে এবার একটু চিন্তিত মনে হল। বলল, "তুমি প্রথমেই বলছিলে যে, প্লাস্টিক চাষবাসে যথেষ্ট সাহায্য করছে, কিন্তু কীভাবে আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।"

কাকু হেসে বললেন, "এটা বোঝাতে একটু সময় লাগবে। খেতের কাজে জল জমিয়ে রাখার জন্যে যে-সব ছোট্ট পুকুর বা ডোবা তৈরি করা হয়, তার নীচে ও পাশে প্লাস্টিক চাদরের মতো পেতে দিলে, তার থেকে জল কোনও দিকে বেরিয়ে যেতে পারে না। এই ব্যবস্থার তুলনায় পাথর বা সিমেণ্ট বাঁধানো পুকুরে অনেক বেশি খরচ পড়ে। স্পেনে কমলালেবুজাতীয় গাছে সেচের জন্যে এমনি ভাবে ৩০ লক্ষ গ্যালন জল জমিয়ে রাখা হয়। দশ বছর ধরে এই পদ্ধতি ওখানে চলছে। এ-ছাড়া সেচের জন্যে নালাতে জমানো জলও ভালভাবে রাখা যায়, যদি তার দু-ধারে প্লাস্টিকের চাদর বিছিয়ে দেওয়া যায়। আজকাল এক উন্নত প্রথায় মাটিতে জল দেওয়া যায়, যার ফলে জলের কোনও অপচয় হয় না। সমস্ত মাটিতে জল না দিয়ে শুধুমাত্র গাছের গোড়ায় বা মূলে প্লাস্টিকের সিরিঞ্জের সাহায্যে জল দিলে গাছ প্রয়োজনমতো জল পায়। আর, জলের সঙ্গে গাছের সারও পরিমাণ মতো দেওয়া যায়। তাতে সারও অযথা নষ্ট হয় না। সারের দাম দিন-দিন খুব বাড়ছে, কাজেই সারের অপচয় রোধ করা খুবই জরুরি। প্লাস্টিক বিছিয়ে যদি মাটি ঢেকে রাখা হয়, তবে তাপে শুকিয়ে যেতে পারে না। এই ঢাকনা যদি কালো হয়, সূর্যের আলোও তাহলে মাটির খুব ভেতরে যেতে পারে না, ফলে ব্যাঙের ছাতার মতো আগাছা জন্মানোর ভয় থাকে না। খোলা জমির চেয়ে ঢাকা-জমি রাত্রে গরম থাকে বলে গাছের মূল তাড়াতাড়ি বড় হয়, গাছও তাড়াতাড়ি বাড়ে। খাদ্য-শস্য ইত্যাদি প্লাস্টিকের বস্তায় বেঁধে রাখলে ভাল থাকে এবং এক জায়গা থেকে আর-এক জায়গায় পাঠাতে সুবিধে হয়।"

ববিকে এবার বেশ গম্ভীর দেখাল। ও ভাবল, কিছু দিন পরে হয়তো প্লাস্টিক দিয়ে গাড়ি, বাড়ি, সাইকেল, ড্রয়িংরুমের ফার্নিচার ইত্যাদিও তৈরি হবে। এ-ভাবে ভাবতে বেশ ভাল লাগল ববির।

সবাই এখন কালিকে খুব আদর করে

পূর্ণিমা দে বয়স ৬

আমাদের বাড়িতে কালো রঙের একটা বিড়াল ছিল। কালো বলে আমি ও মা ছাড়া সবাই ওকে ঘেন্না করত। মা আদর করে ওর নাম রেখেছিল কালি।

কালিকে আমি খুব ভালবাসতাম, কালিও আমাকে খুব ভালবাসত। আমি স্কুল থেকে ফিরে এলেই কালি ছুটে এসে আমার পায়ের কাছে বসে মিঁউ-মিঁউ করত। আমি কোলে তুলে নিলেই কালি চুপ করে যেত।

কখনও কালি চুরি করে খেত না। বরং খিদে পেলে মিঁউ-মিঁউ করে ডেকে বলত, আমায় খেতে দাও। ওর ভয়ে বাড়িতে কোনও ইঁদুর আসত না।

একদিন রাতের অন্ধকারে একটা চোর আমাদের ঘরে ঢুকতেই জানলার ওপর থেকে কালি চোরের মাথার ওপর লাফিয়ে পড়ল। ভয় পেয়ে চোর 'বাবারে' বলে চেঁচিয়ে উঠল।

আমাদের সবার ঘুম ভেঙে গেল। বাবা চোরকে ধরে ফেললেন। সেই থেকে বাড়ির কেউ কালিকে আর ঘেন্না করত না। সবাই কালির বুদ্ধির তারিফ করে কালিকে খুব আদর করত।

চন্দনার কথা আজও আমার মনে পড়ে

ঈপ্সিতা দে বয়স ১২

আমার একটা ছোট্ট পাখি ছিল। তার নাম ছিল চন্দনা। চন্দনাকে আমি খুব ভালবাসতাম। রোজ বিকেলে ছাতে ওর সঙ্গে খেলতাম। ওকে স্নান করাতাম। খাওয়াতাম। চন্দনাও আমায় খুব ভালবাসত। চন্দনার স্বভাবটা খুব ভাল ছিল। কেউ এলে ও তার সঙ্গে কথা বলত। সবার কুশল জিজ্ঞেস করত।

একদিন আমি আমার এক বন্ধুর বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলাম। সেদিন ওর সঙ্গে আমার দেখাই হয়নি। সারাদিন দেখতে না পেয়ে চন্দনা আমার ওপর রেগে গিয়েছিল। তারপর থেকে ও আমার সঙ্গে কথাই বলল না, আমার কাছে স্নান করল না, তাকাল না, এমনি করে কয়েকদিন থাকার পর চন্দনা একদিন খাঁচা ছেড়ে পালিয়ে গেল। আজও আমার চন্দনার কথা মনে পড়ে, আর মনে পড়লেই কান্না পেয়ে যায়।

ছবি ঃ জয়া বসু বয়স ৮

আমার আকাশ

সেদিন আমি ভাবছি মনে-মনে,
না জানি কোন্ রহস্য ঐ আকাশের কোণে।
লোকে বলে আকাশ তুমি অসীম,
কিন্তু আমার প্রাণে পাই তোমাকে সসীম।
আকাশ, তুমি কেন এত নীরব,
কও না কথা, হও না কেন সরব?
না না, তুমি ঐ তো কথা কও—
মেঘের মুখেই সরব তুমি হও,
কালবোশেখে যখন ডাকে বাজ,
তখন তোমার কথা কওয়ার কাজ।
মেঘ বৃষ্টি বাজ সবই আকাশ তোমার—
এদের নিয়ে তুমি হও না শুধু আমার।

ঊর্মিলা পিল্লাই (বয়স ১২)

অনিন্দিতা

ক্লাস নাইনের ফার্স্ট গার্ল অনিন্দিতা। স্কুলের 'মিস'রা তাকে খুব ভালবাসেন।সেইজন্যে ওদের ক্লাসের বেশ কয়েকটি মেয়ে ওকে হিংসে করে। তারা অনিন্দিতার সঙ্গে কথা বলে না, খেলায় ডাকে না।

সেদিন হেডমিস্ট্রেস অলকাদি বললেন, "নাইনের ছাত্রীদের নিয়ে কাল আমরা পিকনিক করতে যাব।" শুনে সবাই খুব খুশি।

পরদিন খুব হৈ-চৈ করে ছাত্রীরা স্কুলের বাসে উঠল। দুপুরবেলা বোটানিক্সে পৌঁছে তারা লাঞ্চ খেল। তারপর শুরু হল ছাত্রীদের গল্পের আসর। কেউ-কেউ জোক্স শোনাল, কেউ-কেউ আবৃত্তি করল, দুজন ভারতনাট্যম দেখাল। সবশেষে অনিন্দিতা গান শোনাল। দারুণ সব গান। ওর গানে আসর জমে উঠল। ওর বান্ধবীরা মুগ্ধ হয়ে গান শুনল। অনিন্দিতা আবার সকলের খুব বন্ধু হয়ে গেল।

বাড়ি ফেরার পথে ওরা গাইল 'আমরা সবাই বন্ধু'। এর পর থেকে অনিন্দিতাকে আর কেউ কখনো হিংসে করেনি।

জয়দীপ মুখোপাধ্যায় (বয়স ১৪)

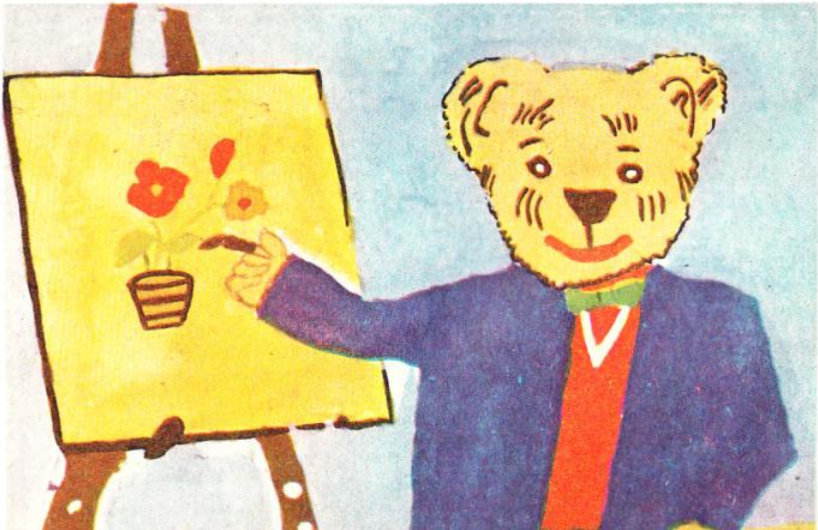

ছবি এঁকেছে **শুভজিৎ সিংহ** (বয়স ১১)

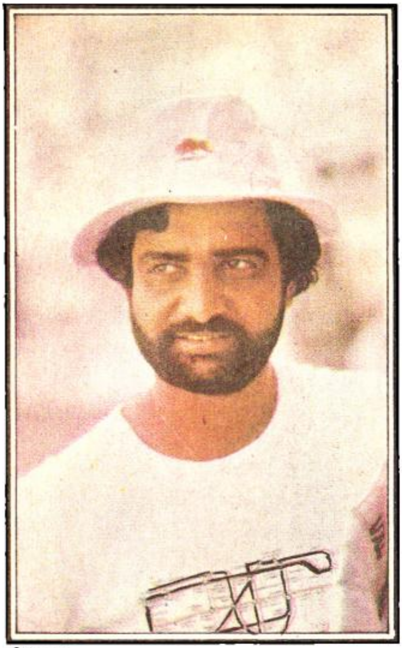

বিশ্বনাথ

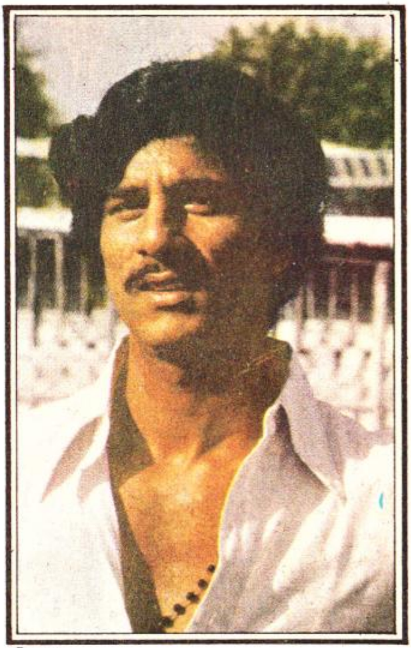

শ্রীকান্ত

ফোটো : নিমাই ভট্টাচার্য

দিলীপ দোশি

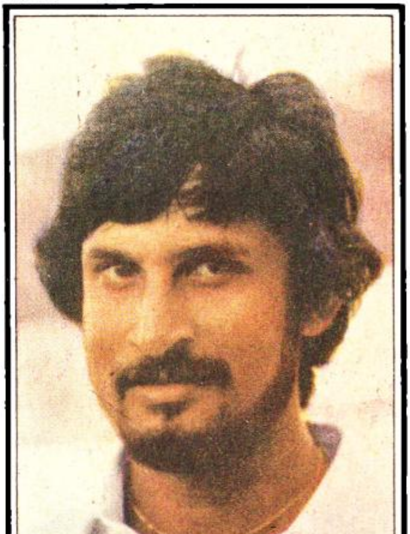

সন্দীপ পাতিল

(পাতা ওলটালেই ক্রিকেটের আরও খবর)

স্মরণীয় সেঞ্চুরি, ইডেনে

মণীশ মৌলিক

আবার সাজ-সাজ রব। শীতের অতিথি ইংল্যাণ্ড দল এবারে কলকাতায়। '৮১-৮২ মরশুমে ভারত-ইংল্যাণ্ড ছটি টেস্টের সিরিজে চতুর্থ টেস্টটি ইডেনে অনুষ্ঠিত হবে। তিন-তিনটি টেস্টম্যাচের পর সরগরম হয়ে উঠবে ইডেন। তাই হট্টগোল পড়ে গেছে কলকাতায়। চল্লিশের ঘর পেরিয়ে যাওয়া অভিজ্ঞ বয়কট এখানে কেমন খেলেন দেখার জন্য মুখিয়ে আছে সবাই। ইংল্যাণ্ড-অস্ট্রেলিয়ার গত মরশুমের লড়াইয়ে প্রায় একাই একশোর ভূমিকা নিয়েছিলেন সুদর্শন অলরাউণ্ডার ইয়ান বোথাম। কী ব্যাটে কী বলে, ইয়ানের শক্ত পাঞ্জার দাপটে নাকাল অস্ট্রেলিয়া কীভাবে বোথামের কাছে বিপর্যস্ত হয়েছে, তা তো তোমরা জানোই। সেই বোথাম এখানে কী করেন, ব্যাটে-বলে সমান দক্ষতা দেখাতে পারেন কি না, দেখবার জন্য তোমরা কি হা-পিত্যেশ করে বসে নেই? আণ্ডারউডের বোলিংয়ের কায়দা দেখবার জন্য কি মনটা ছটফট করছে না?

এ তো গেল ওদিকের কথা। এদিকে, কালীচরণের দলের বিরুদ্ধে সেই যে দুই ইনিংসে সেঞ্চুরি করে গাভাসকার আমাদের চোখ ঝলসে দিয়েছিলেন, তারপরে আর তেমন খেলা তো ইডেনে দেখা গেল না। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে খেলায় ইমরান দু' ইনিংসেই চমৎকারভাবে বুদ্ধি খাটিয়ে একইভাবে গাভাসকারকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। এবার গাভাসকার বেশ ফর্মে আছেন। ইডেনে তাঁর জ্বলজ্বলে একটা সেঞ্চুরি দেখলে তোমরা যে দারুণ খুশি হবে, সেটা বলাই বাহুল্য। আলাভোলা বিশ্বনাথের একশো ঊনচল্লিশ রানের অসাধারণ সেঞ্চুরিটা এখনো চোখ বুজলেই মনে যেন ছবির মতো ভেসে ওঠে। তারপর হিউজেসের দলের বিরুদ্ধে দুর্দান্ত সেই ছিয়ানব্বুই রানের ইনিংসটাও মনে পড়লে ভারী ভাল লাগে। তবে কিনা সেঞ্চুরির স্মৃতির স্বাদ অনেক অনেক ভাল। বেচারা বিশ্বনাথ তারপরে যেন কেমন মিইয়ে গেছেন। চওড়া কবজিতে ধরা শক্ত ব্যাটটা যেন আগের মতো আর ধারালো নেই। আমাদের একান্ত প্রার্থনা, কলকাতায়, গাভাসকারের চেয়েও বেশি জনপ্রিয় বিশ্বনাথ যেন আমাদের নিরাশ না করেন। স্টেডি সন্দীপের ওপর আমাদের আস্থা আছে। তিনি নিজেও শূন্যহাতে ফিরবেন না, আমাদেরও মুষড়ে পড়তে হবে না। যদিও ক্রিকেটে কোনও কিছুই নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। তবু কেন জানি না, পাতিলের ওপর আমাদের প্রচুর আস্থা আছে। আসলে এত আস্থার কথা বলতে চাইছি কেন, তোমরা বোধহয় বুঝতেই পারছ। সোজা কথা, গাভাসকার, বিশ্বনাথ বা পাতিলের কাছ থেকে একটি করে সেঞ্চুরি পাবার ইচ্ছে আমাদের বড় বেশি। একটাও সেঞ্চুরি না হলে গোটা টেস্টটাই কেমন যেন ফাঁকা-ফাঁকা মনে হয়। তাই, ইডেনে টেস্টে একটা সেঞ্চুরি চাই-ই। যেমন-তেমন করে নয়, একেবারে মেরে-পিটিয়ে ছত্রখান করে তোলা জমকালো সেঞ্চুরি চাই, যাতে সেটা ইডেনে স্মরণীয় সেঞ্চুরির তালিকায় আর একটা সংযোজন হতে পারে।

আচ্ছা, তোমাকে যদি কেউ জিজ্ঞেস করে, ইডেনে সবচেয়ে বেশি রান কে করেছেন বলো তো, তবে তুমি কী জবাব দেবে? উত্তরটা হয়তো অনেকেই জানো না। তাই চুপিচুপি জেনে নাও, এ-প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে—রোহন বাবুলাল কানহাই। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের এই বিখ্যাত ডানহাতি ব্যাটসম্যানের নামটা তোমরা সবাই নিশ্চয়ই জানো। ১৯৫৮-৫৯ সালে গেরি আলেকজাণ্ডারের নেতৃত্বে যে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল ভারতে এসেছিল, সেই দলের সদস্য হয়ে কানহাই প্রথমবার ভারতে আসেন। সিরিজের তৃতীয় টেস্ট হয়েছিল ইডেনে। এর আগে বোম্বাইয়ে ও কানপুরে ভাল রান পেলেও কানহাইয়ের জীবনের প্রথম টেস্ট সেঞ্চুরি কিন্তু ইডেনেই। এবং একেবারে ডাবল সেঞ্চুরি—২৫৬। এ-সম্মান টেস্ট ক্রিকেটে খুব কম লোকের কপালেই জুটেছে। ইডেনে বিপক্ষীয় বোলিং-শক্তিকে একেবারে ভেঙে গুঁড়িয়ে চুরমার করে শতরান অর্জনের শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত কানহাই। বোম্বাই ও কানপুরে সুভাষ

গুপ্তে আঙুলের টানে ভেল্কির খেলা দেখিয়েছিলেন। কানপুরে তো তৈরি করেছিলেন নয় উইকেট পাবার বিখ্যাত রেকর্ডটি। ইডেনে গুপ্তে তো বটেই, সঙ্গে ছিলেন দোসর স্পিনার গোলাম আমেদ। ফাদকার-সুরেন্দ্রনাথের গতির আক্রমণের জুটি মোটেই সুবিধে করতে পারল না, গুপ্তে-আমেদের ঘূর্ণি-বলের ছলাকলা বিনষ্ট হয়ে গেল কানহাইয়ের ব্যাটের ঘায়ে। সাড়ে-ছয় ঘণ্টা সময় নিয়ে বিয়াল্লিশটি বাউণ্ডারির সাহায্যে কানহাই এই বিপুলসংখ্যক রান করেছিলেন।

নির্দয় প্রহার ও অসাধারণ ব্যাটিং-দক্ষতার কারণে '৪৮-৪৯ সালে ইডেনে মরশুমের তৃতীয় টেস্টে এভারটন উইকসের দুই ইনিংসে দুটি সেঞ্চুরি স্মরণীয় হয়ে রয়েছে। ওই টেস্টে উইক্‌স প্রথম ইনিংসে ১৬২ ও দ্বিতীয় ইনিংসে ১০১ রান করেছিলেন। এর আগে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে (৪৭-৪৮ সালে) চতুর্থ ও শেষ টেস্টে সাবিনা পার্কে উইক্‌স ১৪১ রান করেছিলেন। গডার্ডের নেতৃত্বে ভারত সফরে এসেই এরপর তিনি দিল্লিতে প্রথম টেস্টে ১২৮, বোম্বাইতে দ্বিতীয় টেস্টে ১৯৪ ও তৃতীয় টেস্টে কলকাতায় দুটি ইনিংসে সেঞ্চুরি করার সুবাদে পরপর পাঁচটি সেঞ্চুরি করার দুর্লভ সম্মানের অধিকারী হন। আজ পর্যন্ত এ-রেকর্ড আর কেউ ভাঙতে পারেননি। বিশেষজ্ঞদের মতে দুই ইনিংসের মধ্যে দুর্দান্ততার দিক দিয়ে প্রথমটির চেয়েও দ্বিতীয়টি ছিল আরও চিত্তাকর্ষক। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিখ্যাত ডব্লিউ-ত্রয়ীর মধ্যে উইক্‌স ছিলেন একটু বেশি ক্ষমাহীন। সেই উইক্‌স· মানকড়-আমেদ-হাজারে-সুঁটে-অমরনাথ-সার-ভাতেকে অবিরাম আঘাতে অতিষ্ঠ করে একটি বিশ্বরেকর্ড গড়ছেন, ভাবো তো দৃশ্যটা কী রোমাঞ্চকর।

অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে ইডেনে সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক সেঞ্চুরিটি করেছেন নর্মান ও'নীল। ৫৯-৬০ সালে ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়ার পাঁচ টেস্টের সিরিজের শেষ টেস্টটি হয়েছিল ইডেনে। সে-টেস্টে ও'নীল তাঁর নামের প্রতি যথাযোগ্য সুবিচার করে ১১৩ রানের একটি অনবদ্য ইনিংস খেলেছিলেন। শিল্পসৌন্দর্যের সুষমামণ্ডিত সেই ইনিংসটি ইডেনে টেস্ট-ক্রিকেটের ইতিহাসের এক অনন্য সম্পদ।

রোহন কানহাই

টনি গ্রেগ

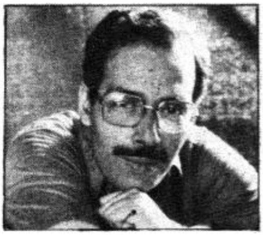

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

এখন ছোটদের মহলেও এক প্রিয় নাম

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় হাসির সঙ্গে মজা, মজার সঙ্গে রোমাঞ্চ, রোমাঞ্চের সঙ্গে উৎকণ্ঠার এক আশ্চর্য মিশেল ঘটিয়েছেন তাঁর 'মনোজদের অদ্ভুত বাড়ি' উপন্যাসে। রাজা গোবিন্দনারায়ণ কেন বিচিত্র ভাষায় কথা বলেন, মনোজদের বাড়িটা ঠিক কোনখানে, সে-বাড়িতে যে-অচেনা ছবি রয়েছে সেই ছবিটি কার কিংবা কীভাবে এক নিখোঁজ যুবরাজ হয়ে গেলেন ডাকাতদলের মেজ-সর্দার, এ-সব প্রশ্নেরই উত্তর এই উপন্যাস। তাঁর নতুন-বেরুনো 'গোঁসাইবাগানের ভূত' একেবারে অন্য ধরনের। ভূত নিয়ে লেখা এক দুর্দান্ত অদ্ভূতুড়ে উপন্যাস 'গোঁসাইবাগানের ভূত।' সদ্য বেরুল : 'হেতমগড়ের গুপ্তধন'।

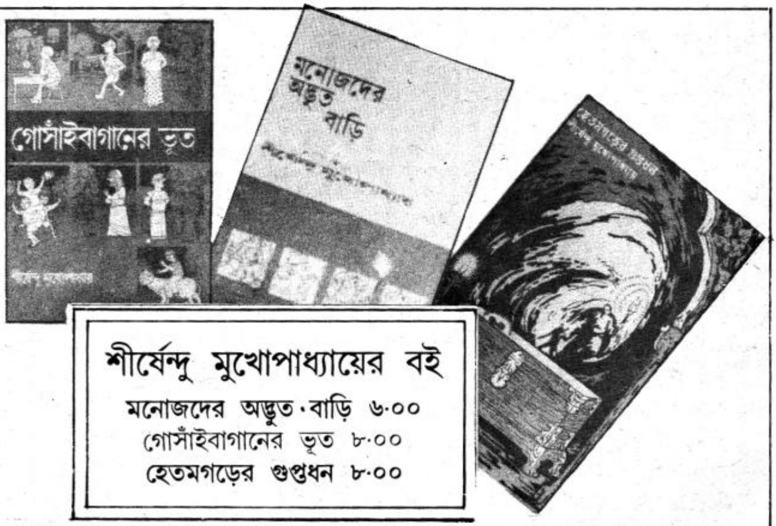

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের বই

মনোজদের অদ্ভুত বাড়ি ৬·০০
গোসাঁইবাগানের ভূত ৮·০০
হেতমগড়ের গুপ্তধন ৮·০০

আরো অনেক বই

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ভয়ঙ্কর সুন্দর ৮·০০ সত্যি রাজপুত্র ৮·০০ তিন নম্বর চোখ ৬·০০ হলদে বাড়ির রহস্য ও দিনে ডাকাতি ৮·০০ সবুজ দ্বীপের রাজা ৮·০০ জঙ্গলের মধ্যে গম্বুজ ৮·০০ ডংগা ৭·০০ পাহাড়চূড়ায় আতঙ্ক ১০·০০ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ঘণ্টাদার কাবলু কাকা ৮·০০ অব্যর্থ লক্ষ্যভেদ এবং ৭·০০ তপনচরিত ৬·০০ সমগ্র কিশোর সাহিত্য প্রথম ২৫·০০ দ্বিতীয় ২৫·০০ পূর্ণেন্দু পত্রীর কী করে কলকাতা হলো ৫·০০ ছড়ায় মোড়া কলকাতা ৫·০০ কলকাতার রাজকাহিনী ৫·০০ হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের ভয়ের মুখোশ ৮·০০ সীমানা ছাড়িয়ে ৬·০০ পাঁচ মুণ্ডির আসর ৭·০০ কবন্ধ বিগ্রহের কাহিনী ১০·০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা ৯ ফোন ৩৪ ৪৩৬২

সেদিন ইডেনে ক্রিকেটে সম্ভাব্য যাবতীয় মারের বন্যা ছুটিয়েছিলেন নর্মান ও'নীল। মারমুখী ও'নীলকে থামাবার প্রাণপণ চেষ্টা করেও বিফল হয়েছিলেন দেশাই, রামচাঁদ, প্যাটেল, বোরদে, নাদকার্নির মতো বোলাররা। ঘটনাক্রমে ও'নীলের সেঞ্চুরিটিই ছিল ইডেনে একজন অস্ট্রেলিয়ানের প্রথম শতরান। '৭৯ সালে ভারত-অস্ট্রেলিয়া খেলায় ইডেনে অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে সেঞ্চুরি করেছিলেন গ্রাহাম ইয়ালোপ। ইয়ালোপের ১৬৭ রান হয়তো রানসংখ্যায় ও'নীলের চেয়ে বেশি ছিল, কিন্তু আত্মবিশ্বাসের দৃঢ়তায় বা সংহারের রাজসিকতায় ইয়ালোপের ইনিংস কখনোই ও'নীলের সঙ্গে তুলনীয় নয়।

ইংল্যাণ্ডের পক্ষে দুটি সেঞ্চুরির মধ্যে কলিন কাউড্রে ৬৩-৬৪ সালে তৃতীয় টেস্টে ইডেনে সেঞ্চুরি করেছিলেন। হাতে চোট ও পায়ের পেশীতে টান ধরা সত্ত্বেও ধৈর্য ও সংযমে ভরা একটি চমৎকার ইনিংস খেলেছিলেন ঈষৎ স্থূলকায় মাইকেল কলিন কাউড্রে। প্রথম দুটি টেস্ট হয়ে যাওয়ার পর তাঁকে যখন কলকাতায় খেলবার জন্য পাঠানো হল, হাতের চোটের অবস্থা দেখে অনেকের মনেই সন্দেহ হয়েছিল কাউড্রে হয়তো আশানুযায়ী খেলতে পারবেন না। অসীম ধৈর্যে সেই সন্দেহের মুখে ছাই দিয়ে কাউড্রে শান্ত স্নিগ্ধ একটি সেঞ্চুরি দর্শকদের উপহার দিয়েছিলেন। গায়ে একশো তিন ডিগরি জ্বর আর দারুণ ব্যথা নিয়েও ৭৬-৭৭ সালে দ্বিতীয় টেস্টে ইডেনে আরও একটি ধীর সেঞ্চুরি করেছিলেন অধিনায়ক টনি গ্রেগ। দীর্ঘকায় গ্রেগ আদৌ ব্যাট করতে পারবেন কিনা এ-সম্পর্কেএক সময় সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন ইংল্যাণ্ড দলের ম্যানেজার। কিন্তু রসিক গ্রেগ ম্যানেজারকে উত্তর দিয়েছিলেন, "গোল্লাই করি আর যা-ই করি, আমি ব্যাট হাতে মাঠে নামবই। কলকাতার ক্রিকেটরসিক দর্শকদের যদি প্যাড-ব্যাটে সেজে একবার দেখা না দিতে পারি, নিজের কাছে কী জবাব দেব বলুন দেখি।" ম্যানেজার স্মিত হেসেছিলেন। তারপর প্রথমবার পিঠ চাপড়েছিলেন। দ্বিতীয়বার পিঠ চাপড়েছিলেন যখন সেঞ্চুরি করার পরে জ্বরে-ভাজা-ভাজা গ্রেগ ধুঁকতে-ধুঁকতে প্যাভেলিয়নে ফিরে এলেন।

'৭৮-৭৯ সালে তৃতীয় টেস্টে ওঃ ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে ভারতের পক্ষে গাভাসকারের দুই

নর্মান ও'নীল

ইনিংসে সেঞ্চুরি একটি স্মরণীয় ঘটনা। কেননা, ওই টেস্টে দুই ইনিংসে শতরান করার সুবাদে তিনি তিনবার দুই ইনিংসে সেঞ্চুরি করার বিরল গৌরব অর্জন করেন। প্রথম ইনিংসে গাভাসকার ১০৭ রান ও দ্বিতীয় ইনিংসে ১৮২ রান করেছিলেন। দ্বিতীয়টির তুলনায় প্রথম শতরানটি ছিল নিখুঁত, আত্মপ্রত্যয়ী এবং ব্যাটিংয়ে তাঁর প্রতিভার চমৎকার পরিচায়ক। ছন্দোবদ্ধ ধ্বংসকার্যের জন্য স্মরণীয় হয়ে আছে '৪৮-৪৯ সালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে মুস্তাক আলির ১০৬ রানের অসাধারণ ইনিংসটি। বিবিধ মারের ছটায় উজ্জ্বল সেই চমৎকার ইনিংসটি ওয়েস্ট ইণ্ডিজের গম্ভীর ও স্বল্পবাক অধিনায়ক গডার্ডেরও স্বতঃস্ফূর্ত প্রশংসা আদায় করেছিল। আর একটি স্মরণীয় ইনিংসের কথা তো গোড়াতেই বলেছি। বিশ্বনাথের সেই জ্বলজ্বলে ১৩৯ রান। যা চোখ বুঁজলেই ছবির মতো মনে পড়ে।

যে-কটা সেঞ্চুরির কথা বললাম, তার বাইরেও হয়তো অনেকে আরও নানা সেঞ্চুরির কথা মনে করতে পারেন। হয়তো এ-ব্যাপারে দ্বিমত থাকতেও পারে। কিন্তু আবার ইডেনে টেস্ট অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। আবার সাজ-সাজ রব। এ-টেস্টে যদি ভারতের কেউ একটা সেঞ্চুরি করতে পারেন তাহলে যে সেটা সবারই ভাল লাগবে, এ ব্যাপারে নিশ্চয় দ্বিমতের অবকাশ নেই।

ফিঙ্গলটনের বিদায়

মণি শর্মা

জ্যাক ফিঙ্গলটন

ক্রিকেট খেলে বিখ্যাত হওয়া এক জিনিস, ক্রিকেট নিয়ে লিখে বিখ্যাত হওয়া আর এক জিনিস। কিন্তু ক্রিকেট খেলে এবং লিখে বিপুল খ্যাতি ও সম্মান অল্প যে-কয়েকজন পেয়েছেন, তাঁদের মধ্যে আছেন জ্যাক ফিঙ্গলটন। ক্রিকেটে তাঁর ইনিংস শেষ হয়েছে বহুকাল আগেই। জীবনের ইনিংস থেকে বিদায় নিলেন এই সেদিন, ৭৩ বছর বয়েসে।

দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ১৯৩১-৩২ সালে মেলবোর্নে পঞ্চম টেস্টে ফিঙ্গলটন অস্ট্রেলিয়া দলে খেলার জন্য নির্বাচিত হন। সেই তাঁর আবির্ভাব। তারপর থেকে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত তিনি টেস্ট খেলেছেন। ফিঙ্গলটন টেস্ট ক্রিকেটে প্রথম পর-পর চার ইনিংসে শত রান করেছিলেন। ১৯৩২-৩৩ সালে ইংল্যাণ্ডের অস্ট্রেলিয়া সফরকালে তৃতীয় টেস্টে দুই ইনিংসেই গোল্লা করার পরে দল থেকে তিনি বাদ পড়েন।

১৯৩৫-৩৬ মরসুমে দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে তাঁকে দলে রাখা হয়েছিল। কেপটাউনে তৃতীয় টেস্টে ১১২ রান, জোহান্সবার্গে চতুর্থ টেস্টে ১০৮ রান ও ডারবানে পঞ্চম টেস্টে ১১৮ রান করেছিলেন ফিঙ্গলটন। ১৯৩৬-৩৭ সালে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ব্রিসবেনে প্রথম টেস্টে শত রান করার সুবাদে তিনি প্রথম পর-পর চারটি ইনিংসে শত রান করার সম্মান লাভ করেন। ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ব্র্যাডম্যানের সঙ্গে ষষ্ঠ উইকেটের জুটিতে তোলা ৩৪৬ রান এখনও বিশ্ব-রেকর্ড।

খেলা থেকে অবসর নেওয়ার পরে ফিঙ্গলটন লেখালেখি শুরু করেন। শুরু থেকেই বিপুল প্রশংসা পান তিনি। খবরের কাগজে ক্রিকেট নিয়ে লেখা ছাড়াও তিনি বই লিখতে শুরু করেন। ক্রিকেট-প্রেমী মানুষ বরাবরই উৎসাহী ছিলেন ফিঙ্গলটনের লেখা পড়ার জন্য। পরবর্তীকালে রাজনৈতিক সংবাদদাতার পেশায় নিজেকে যুক্ত করেছিলেন ফিঙ্গলটন, কিন্তু কখনোই ক্রিকেট নিয়ে লেখা থেকে সরে আসেননি। তাঁর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল ব্রিসবেনের টাই-টেস্ট নিয়ে। বড় হয়ে এই বইটি তোমরা অবশ্যই পড়বে।

সত্তর বছর বয়েসে মার্ক টোয়েন ঠিক করলেন যে, যা ইচ্ছে করার মতো যথেষ্ট বয়েস এখন তাঁর হয়েছে। তিনি চোদ্দ প্রস্থ সুট এবং একশোটি টাইয়ের অর্ডার দিলেন। সব সাদা। আগাগোড়া ধবধবে সাদা পোশাক পরে আমৃত্যু কাটিয়ে দিলেন বিখ্যাত লেখক মার্ক টোয়েন।

ভারত-ইংল্যাণ্ড, ইডেনে

অশোক রায়

শীতের কলকাতার সবচেয়ে বড় আকর্ষণ কী? বলা নিষ্প্রয়োজন, পুলিপিঠে, নলেন গুড় আর ফুলকপির শিঙাড়াকে সরিয়ে রেখে অনেকেই যেদিকে ঝুঁকবে, নিঃসন্দেহে সেটি—টেস্ট ক্রিকেট। 'ক্রিকেট' শব্দটার সঙ্গে যে-দেশের মাধ্যমে আমাদের পরিচয় ঘটেছে সেই ইংল্যাণ্ড দল আর ক'টা দিন পরেই ইডেনে টেস্ট খেলতে নামছে। বথাম, বয়কট, ফ্লেচার উইলিস, আণ্ডারউডদের এখন শুধু চোখের সামনে দেখতে পাবার অপেক্ষা। অপেক্ষা অবশ্য খুব ক্লান্তিকর মনে হবে না যদি এই ফাঁকে ইডেনে ভারত-ইংল্যাণ্ডের আগের ফলাফলে একটু চোখ বুলিয়ে নেওয়া যায়।

১৯৩৪ সালের ৫ই জানুয়ারির সকালটি কলকাতার ক্রিকেট-পাগল মানুষদের প্রথম উপহার দিল সরকারি 'টেস্ট' ক্রিকেটের অমৃত-স্বাদ।

ইংল্যাণ্ডের কূট-কৌশলী ক্যাপ্টেন ডগলাস জার্ডিন (যিনি সবসময় অক্সফোর্ড কাউন্টির ক্যাপ পরতেন) টসে ভারতের অধিনায়ক সি·কে· নাইডুকে হারিয়ে সহজ উইকেটে ব্যাটিং নিলেন।

দীর্ঘদেহী মহম্মদ নিসার এবং অমর সিংয়ের (১০৬ রানে ৪ উইকেট) ঝাঁঝালো পেস বোলিং ছাড়াও সি·কে· নাইডুর (৪০ রানে ৩ উইকেট) মাধ্যমে ভারত আক্রমণ চালাল। কিন্তু অলরাউণ্ডার জে· ল্যাংরিজের ৭০, অধিনায়ক জার্ডিনের ৬১ এবং শেষ পর্বে স্পিনার হেডলি ভেরিটির অপরাজিত ৫৫ ইংল্যাণ্ডকে পৌঁছে দিল ৪০৩ রানের নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে।

জবাবে ভারত গুটিয়ে গেল মাত্র ২৪৭ রানে। বাঁ-হাতি 'নবি' ক্লার্ক এবং নিকল্‌সের মতো আক্রমণাত্মক ফাস্টবোলারদের বিরুদ্ধে উইকেটরক্ষক দিলওয়ার হোসেন তাঁর আবির্ভাব-লগ্নটিকে সাজালেন ৫৯ রানের সাহসী ইনিংস খেলে। ছ' নম্বরে ব্যাট করতে এসে বিজয় মার্চেন্ট করলেন ৫৪ রান। ক্লার্ক,

সি. কে. নাইডু

নিকল্‌স্ তিনটি করে উইকেট ভাগাভাগি করে নিলেও বাঁ-হাতি স্পিনার ভেরিটি তাঁর নিখুঁত লেংথ এবং স্পিনের দক্ষতায় চারজনকে ফিরিয়ে দিলেন ৬৪ রানে। ভারত ফলো-অনের কবলে পড়ল (এ পর্যন্ত ইংল্যাণ্ড ন'বার ভারতকে ফলো-অন করিয়েছে)।

দ্বিতীয় ইনিংসেও সাহসী দিলওয়ারের ৫৭ ছাড়া তেমন কোনো প্রতিরোধ ভারতের পক্ষে ছিল না। নিক্‌ল্‌সের বলে মাথায় প্রচণ্ড আঘাত পাবার পর দু'ইনিংসে দিলওয়ারের অর্ধশতাধিক রান নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। ভারত ইনিংস শেষ করল মাত্র ২৩৭ রানে। ক্লার্ক তিনটি এবং ভেরিটি চারটি উইকেট নিলেন। জেতার মতো সময় ছিল না ইংল্যাণ্ডের হাতে। সাত রানে দু'উইকেট পড়ার পরই চারদিনের খেলার মেয়াদ শেষ হয়ে যায়।

১৯৫১ সালের ৩০শে ডিসেম্বর তৃতীয় টেস্ট শুরু হয়েছিল ইডেনে। কম্পটন, হাটন, ইভান্স, বেডসার, সিম্পসন সেবার দলের সঙ্গে ভারত-সফরে আসেননি। দুর্বল ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ভারতের অধিনায়ক হাজারে টসে হার মানার সঙ্গে-সঙ্গে কেউ কেউ আক্ষেপ শুরু

মহম্মদ নিসার

করেছিলেন, কারণ সেটা ছিল ভারতের 'আনলাকি তেরো'-তম টেস্ট। নাইজেল হাওয়ার্ডের নেতৃত্বাধীন ইংল্যাণ্ড ব্যাট করার প্রথম সুযোগ কাজে লাগিয়ে ৩৪২ রানের ইনিংস গড়ে, মূলত টাক-মাথা বাঁ-হাতি অলরাউণ্ডার অ্যালান ওয়াটকিন্স (৬৮) এবং প্রথম-খেলতে-নামা সি·জে· পুলের ৫৫ রানের সহায়তায়। দুই দক্ষ অলরাউণ্ডার ফাদকার (৩ উইকেট) এবং বাঁ-হাতি মানকড় (৪ উইকেট) পেস-স্পিনের সুচতুর আক্রমণ গড়লেন।

সমানে সমানে জবাব দিল ভারত। ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে কলকাতা মাঠে প্রথম টেস্ট সেঞ্চুরিটি করলেন ফাদকার (১১৫)। মানকড় (৫৯) মঞ্জরেকার (৪৮) এবং পঙ্কজ রায়ের (৪২) সহায়তায় রান পৌঁছল ৩৪৪-এ। মিডিয়াম ফাস্ট বোলার এফ রিজওয়ে এবং অফ্‌স্পিনার রয় ট্যাটরসল চারটি করে উইকেট ভাগ করে নিলেন। ইংল্যাণ্ড দ্বিতীয় দফায় পাঁচ উইকেটে ২৫২ রানে (স্পুনার ৯২, পুল ৬৯) ইনিংস ডিক্লেয়ার করে খেলায় কিছুটা প্রাণ ফেরাতে চেয়েছিল। ভারতের গোড়াপত্তনকারী দুই ব্যাটসম্যান পঙ্কজ রায় এবং মানকড় (৭১) অপরাজিত থেকে শেষ পর্যন্ত সংগ্রহ করলেন ১০৩ রান। ১৩-তম টেস্টটি ভারতের পক্ষে তেমন অশুভ হয়ে ওঠেনি বটে কিন্তু ইংল্যাণ্ড ওই সিরিজেই মাদ্রাজে ৫ম টেস্টে প্রথম হার মানে ভারতের কাছে।

ইংলিশ ক্রিকেটের 'রাজপুত্র' টেড ডেক্সটারের অধিনায়কত্বে ইংল্যাণ্ড চতুর্থ টেস্ট খেলে ইডেনে ১৯৬১ সালের ৩০শে ডিসেম্বর থেকে।

টসজয়ী অধিনায়ক নরি কনট্রাক্টরের ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত যে নির্ভুল ছিল তার প্রমাণ মিলল যখন ভারত ৩৮০ রান সংগ্রহ করল বিজয় মেহেরা (৬২), মনসুর আলি পাতৌদি (৬৪) এবং চান্দু বোরদের (৬৮) দক্ষতায়। এই ইনিংসটিই এখনও পর্যন্ত ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ইডেনে ভারতের সর্বোচ্চ সংগ্রহ। অফ্-স্পিনার ডেভিড অ্যালেন ৬৭ রানে ৫ উইকেট নিয়ে গোড়াতেই বুঝিয়ে দিলেন উইকেট জোর স্পিন নিচ্ছে। জবাবে ইংল্যাণ্ড ইনিংস শেষ করল ২১২ রানে। বাঁ-হাতি পিটার রিচার্ডসন ৬২ এবং ডেক্সটার ৫৭ ছাড়া বোরদে (৪ উইকেট) দুরানির (৫ উইকেট) স্পিনের মোকাবিলা করতে পারলেন না কেউ। দুরানির ৪৭ রানে ৫ উইকেট নেবার নজিরটি আজও ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে ইডেনে ভারতীয়দের সবসেরা বোলিং-কীর্তি।

১৬৮ রানে এগিয়ে ভারত দ্বিতীয় দফায় সংগ্রহ করল ২৫২ রান, যার মধ্যে বোরদের সংযত ৬১ রান উল্লেখযোগ্য। অ্যালেন এবং টাকমাথা টনি লক চারটি করে উইকেট নিলেন। ৪৯০ মিনিটে ৪২১ রান করার চ্যালেঞ্জ থাকলেও ইংল্যাণ্ড ধসে গেল ২৩৩ রানে। প্রথম ইনিংসের মতোই রিচার্ডসন (৪২) এবং ডেক্সটার (৬২) সংগ্রাম করলেন ভারতীয় স্পিনারদের বিরুদ্ধে। স্পিন-সহায়ক উইকেটে ডেক্সটারের ৬২ রানের ইনিংসটি ইডেনে-দেখা অন্যতম সেরা ইনিংস হিসেবে যেমন চিহ্নিত হয়ে রইল তেমনি পাশাপাশি একটি অগৌরবেরও তিনি অংশীদার হয়ে রইলেন। ডেক্সটারই প্রথম ইংরেজ অধিনায়ক যিনি ভারতের বিরুদ্ধে সিরিজ (২-০) হারলেন।

১৯৬৪-র ২৯শে জানুয়ারি ইডেনের বৃষ্টি-বিঘ্নিত তৃতীয় টেস্টে পাতৌদি মাইক স্মিথকে টসে হারিয়ে ব্যাটিং নিলেন। ভারত

পৌঁছল ২৪১ রানে, যার মধ্যে ছিল সারদেশাইয়ের ৫৪ এবং বাপু নাদকার্নির অপরাজিত ৪৩। প্রাইস পেলেন ৭৩ রানে ৫ উইকেট, দশম উইকেটে নাদকার্নি এবং চন্দ্রশেখর ৫১টি মূল্যবান রান জুড়ে ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে রেকর্ড গড়লেন।

জবাবে ইংল্যাণ্ড ২৬৭ করতে পারত না, যদি না ইংল্যাণ্ড থেকে উড়ে এসে কলিন কাউড্রে ধীরস্থির ১০৭ রানের ইনিংসটি খেলতেন। সন্দেহ নেই কাউড্রের ইনিংসটি কিছু লোককে বিরক্ত করেছিল। কিন্তু ভুললে চলবে না ভারতে আসার ঠিক আগেই ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে কাউড্রের হাত ভেঙে গিয়েছিল। খুদে দেশাই পেস বোলিংয়ের ঝাপ্‌টায় সরিয়ে দিয়েছিলেন চার ইংরেজকে মাত্র ৬২ রানের বিনিময়ে।

ভারত দ্বিতীয় ইনিংসে ৭ উইকেটে তিনশো রান সংগ্রহ করল মূলত জয়সীমার বুক-চেতানো ১২৯ রানের সুবাদে। ছ'ফুট সাড়ে সাত ইঞ্চি লম্বা ফাস্টবোলার ডেভিড লারটার দুটি উইকেট পেলেন ২৭ রানে। ইংল্যাণ্ড সময় কাটানোর খেলা শেষ করল দু'উইকেটে ১৪৫ রান করে। ক্যাপ্টেন মাইক স্মিথ অপরাজিত রইলেন ৭৫ রানে।

বয়কট, ইলিংওয়ার্থ, এডরিচবিহীন যে ইংল্যাণ্ড দল টনি লুইসের নেতৃত্বে ইডেনে দ্বিতীয় টেস্টে নেমেছিল ১৯৭২ সালের ৩০শে ডিসেম্বর সেটি সমালোচকদের মতে দুর্বলতম ইংল্যাণ্ড। পাশাপাশি ওয়েস্ট ইণ্ডিজ এবং ইংল্যাণ্ডের মাটিতে 'রাবার' জয়ের গৌরব তখন ভারতীয় ক্রিকেটকে উজ্জ্বল করে রেখেছে।

টস-জয়ী ওয়াদেকারের ৪৪ এবং ফারুক ইঞ্জিনীয়ারের ৭৫ সত্ত্বেও ভারত ২১০ রানে ইনিংস শেষ করল। দুর্ধর্ষ স্পিনার 'ত্রয়ী' চন্দ্রশেখর (৫ উইকেট), প্রসন্ন (৩ উইকেট), এবং বেদীর (২ উইকেট) সামনে ইংল্যাণ্ড অসহায়ভাবে ইনিংস শেষ করল ১৭৪ রানে। ৩৬ রানে এগিয়ে থাকার সুযোগ ভারত নিতে পারল না। গুটিয়ে গেল মাত্র ১৫৫ রানে।

১৯১ রানের চ্যালেঞ্জ সামনে রেখে ইংল্যাণ্ড দ্বিতীয় দফায় আশ্চর্যভাবে মুড়িয়ে গেল বেদী (৫ উইকেট) ও চন্দ্রশেখরের (৪ উইকেট) সামনে মাত্র ১৬৩ রানে। একা লড়লেন দীর্ঘদেহী গ্রেগ (৬৭)। যদিও ইংল্যাণ্ড কলকাতা

ভিনু মানকড়

টেস্টে তাদের সর্বনিম্ন স্কোর করল এই ম্যাচেই। ভারত পঞ্চম দিনের লাঞ্চের পরেই জিতে গেল ২৮ রানে। খুনি মেজাজে চন্দ্রশেখর ম্যাচে ন'টি ইংরেজ ক্রিকেটারকে বধ করলেন মাত্র ১০৭ রানের বিনিময়ে। স্বীকার না করলে অন্যায় হবে অসুস্থ অধিনায়ক ওয়াদেকারের পরিবর্তে এই ম্যাচে ইঞ্জিনীয়ার ভারতকে প্রায় সারাক্ষণই সফল নেতৃত্ব দেন।

ভারতীয় ক্রিকেটের পঞ্চাশতম টেস্টটি ইডেনে হওয়ায় অনেকেই জেতার স্বপ্ন

জয়সীমা

আম্পায়াররাও মানুষ

তপন ঘোষ

আম্পায়ারদের বড় দুর্দিন গেছে গত নভেম্বরের শেষটায়। হকি আর ক্রিকেট, বদনামে দুই তরফের আম্পায়ারদেরই মাথা হেঁট। ওই অসময়ে ওঁদের ঘাড়ে মঘা না অশ্লেষা, কী যে জেঁকে বসেছিল, কে জানে। চারদিকে হৈ হল্লা। পাকিস্তানি হকি-আম্পায়ার বাগদাদির বদনামের ভাগিদার হতে হল ভারতীয় সতীন্দর পালকেও। লজ্জার মাথা খেয়ে বাগদাদি বোম্বাইয়ের প্রথম টেস্টে পাকিস্তানের দিকে টেনে খেলা চালিয়ে যান, এবং নিজের দেশকে জিতিয়ে দেন। স্বভাবতই ভারতীয় হকি কর্তৃপক্ষ তাতে ক্ষুণ্ণ। ঠিক হয়, বাগদাদি ফের এমন কাণ্ড করলে বদলা নেওয়া হবে। কলকাতায় আবার বাগদাদি সেই দুষ্টুমি শুরু করেন। ফলে ব্যাপারটাকে এই তরফেও বিনাবাক্যে মেনে নেওয়া হয়নি। খেলার রসিকরা তাতে স্বভাবতই ক্ষুণ্ণ। অন্যরাও খাপ্পা। প্রস্তাব ওঠে, নিরপেক্ষতা বজায় রাখা চাই, সুতরাং অন্য দেশ থেকে আম্পায়ার আনিয়ে খেলা চালানো হোক। প্রস্তাবমতো ওলন্দাজ ও জার্মান আম্পায়ার আনিয়ে শেষ দুটো টেস্ট পরিচালনার দায়িত্ব তাঁদের দেওয়া হয়। লাহোর ও করাচিতে তাঁরাই খেলা পরিচালনা করবার দায়িত্ব নিয়েছিলেন।

ভাল কথা। কিন্তু প্রশ্ন হল, নিরপেক্ষ দেশের আম্পায়াররাও যদি নিরপেক্ষ না থাকেন? তখন কী হবে? তখন কি অন্য কোনও গ্রহ থেকে আম্পায়ার আনিয়ে খেলা চালানো হবে?

ভারত-ইংল্যাণ্ডের প্রথম ক্রিকেট টেস্ট পরিচালনার দায়িত্ব যাঁদের হাতে ছিল, সেই স্বরূপকিষেণ ও রামস্বামীও কম সমালোচনা সহ্য করলেন না। ফ্লেচারের নামী-দামি দল যে ১৬৬ রানে ইনিংস শেষ করতে পারে, ইংরেজ সাংবাদিকরা তা ভাবতেই পারেননি। তাও কিনা ভারতবর্ষে? সাংবাদিকরা তাই

রেগে গিয়ে কী না বললেন দুই আম্পায়ারকে। একজনকে বললেন "হোঁতকা", আর অন্যজনকে "শুঁটকো"। উদ্দেশ্যটা হল দুই আম্পায়ারকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে লোকের চোখে খাটো করা। তাঁরা এমনও বললেন যে, ওঁরা হচ্ছেন ঘাতক, এবং ওঁদের না-সরালে ইংল্যাণ্ডের ভরাডুবি হবে। ইংল্যাণ্ডের খেলোয়াড়রা আউটের জন্য তিরিশবার আবেদন জানিয়েছিলেন, তার মধ্যে মাত্র উনিশটি আবেদন মেনে নেওয়া হয়। এত বড় আস্পর্দা? সব আবেদন কেন মানা হল না, সম্ভবত এটাই এই সাংবাদিকদের প্রশ্ন।

খুব তেতো লেগেছে এই অভিযোগগুলি। ভারতের জয়ে কোথায় আমরা সবাই আনন্দ করব, তা নয়, ঘুরিয়ে ওঁরা বলতে লাগলেন যে, এই জয়ের মূলে রয়েছে আম্পায়ারদের কারচুপি।

বোঝা যাচ্ছে, পরাজয়ের ব্যাপারটাকে ওঁরা সহজ মনে মেনে নিতে পারছেন না। খেলোয়াড়রাই কি সর্বদা পারেন? মনে পড়ছে পাকিস্তানে খেলতে এসে হেরে গিয়ে ইংরেজ ক্রিকেট-খেলোয়াড়রা আম্পায়ারকে হোটেলে ডেকে এনে তাঁর মাথায় ঠাণ্ডা জল ঢেলে দিয়েছিলেন।

যাই হোক, ইংরেজ সাংবাদিকরা শেষ পর্যন্ত নিজেদের কথা নিজেরাই হজম করেছেন। স্বীকার করছেন যে, না, আম্পায়ারদের কারচুপিতে নয়, খারাপ খেলেই ইংল্যাণ্ড হেরেছে। সম্ভবত ওঁদের মনে পড়েছে যে, ক্রিকেটের সহবত শেখাবার ব্যাপারে ইংল্যাণ্ডের ভূমিকা কী। আম্পায়ারদের সিদ্ধান্ত নিয়ে কথা তোলা রীতিবিরুদ্ধ। বিখ্যাত ইংরেজ আম্পায়ার ফ্র্যাঙ্ক চেস্টারের কথা মনে পড়ছে। তিনি বলেছিলেন, আম্পায়ারিং করা চড়ুইভাতির ব্যাপার নয়। ইংরেজ ফাস্ট বোলার জন স্নোও বলেছেন, আম্পায়ারিং করাটা যেন দুঃস্বপ্নের মতো ব্যাপার। চেস্টার আর স্নো, দুজনেই কিন্তু একটা ব্যাপারে একমত। সেটা এই যে, আম্পায়াররাও মানুষ, তাঁদের ভুলচুক নিয়ে হৈ-চৈ করা উচিত নয়। বাড়াবাড়ি করলে ক্রিকেটেরই ক্ষতি হবে।

সেলিম দুরানি

দেখতে শুরু করেছিলেন। ১৯৭৭-এর ১লা জানুয়ারি কলকাতায় আরম্ভ হয়েছিল সিরিজের ২য় ম্যাচ। বেদী টস জিতলেও বাড়তি সুবিধে পেল না ভারত। বব উইলিসের (৫ উইকেট) পেস বোলিংয়ের ধাক্কায় ভারত ধসে গেল মাত্র ১৫৫ রানে।

ইংল্যাণ্ড জবাব দিল ভালভাবেই। অধিনায়ক টনি গ্রেগ ভারতীয় স্পিনারদের বিরুদ্ধে নতুন কৌশলের আশ্রয় নিলেন এবং অনিবার্যভাবেই সাফল্য পেলেন। ভারতীয় স্পিনারদের আক্রমণ না করে স্লো উইকেটে অপেক্ষা করে খেলার ফল যে ভাল হয়, তার প্রমাণ রাখল ইংল্যাণ্ড ৩২১ রান করে, যার মধ্যে গ্রেগের ধীরস্থির ১০৩ এবং টেস্টে সদ্য-আবির্ভূত রজার টলচার্ডের ৬৭ ছিল উল্লেখযোগ্য। বেদী (৫ উইকেট) এবং প্রসন্ন (৪ উইকেট) বোলিংয়ে সাফল্য পেলেন। দ্বিতীয় ইনিংসেও ভারত দাঁড়াতে পারল না। ব্রিজেশ প্যাটেলের ৫৬ রান সহ ভারত শেষ হল ১৮১-তে। গঙ্গার হাওয়া কাজে লাগিয়ে ক্রিস ওল্ড খুব ভাল বল (৩ উইকেট) করলেন। টাকমাথা বাঁ-হাতি স্পিনার আণ্ডারউডও পেলেন তিনটি উইকেট।

জয়ের জন্য ষোলোটি রান প্রয়োজন, ইংল্যাণ্ড সেটা মেটাল বিনা উইকেটে। কলকাতায় অনুষ্ঠিত ছটি টেস্টের মধ্যে ইংল্যাণ্ড জয়ের মুখ দেখল সেই প্রথম।

ক্রিকেট-শব্দসন্ধান

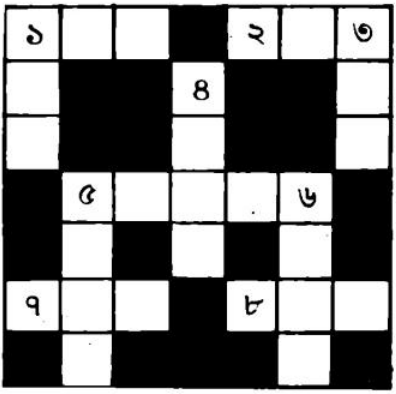

ইডেনে ভারত-ইংল্যাণ্ড টেস্ট উপলক্ষে এই বিশেষ শব্দ-সন্ধান। ছক পূরণ করতে হবে শুধু এই দুই দেশের কয়েকজন অতীত ও বর্তমান ক্রিকেটারের নাম দিয়ে—কখনও সে-নাম সংক্ষিপ্ত, কখনও পরিচয় বা পদবী মাত্র।

সংকেত: পাশাপাশি: (১) বিখ্যাত পিতাপুত্রের এই একই পরিচয়। (২) এই ইংরেজ ব্যাটসম্যান ভারতের বিরুদ্ধে দুটি সেঞ্চুরি করেছিলেন। (৫) বিখ্যাত এক মুনির নামে কার নাম? (৭) টেস্ট ক্রিকেটে ব্রাডম্যানের সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড প্রথম ভেঙেছিলেন। (৮) এক পদবী-পরিচয়ে আবার পিতাপুত্র—পিতা সর্বকালের এক সেরা অলরাউণ্ডার।

উপর-নীচ: (১) শুধু এই পদবীতে খুব একটা বিখ্যাত ব্যাটসম্যান এখনও হননি, তবে হাতে যা চোস্ত মার—অচিরেই হয়তো হবেন। (৩) অতীতের বিখ্যাত ফাস্ট বোলার। (৪) ইংল্যাণ্ডের এই প্রাক্তন বোলারের পুরো নামের প্রথমার্ধ আরও দুজন বিখ্যাত ইংরেজ ক্রিকেটারের নামে পাওয়া যাবে। (৫) বিখ্যাত ব্যাটসম্যান, ফুটবল খেলাতেও খুব নামডাক ছিল। (৬) বর্তমানে পৃথিবীর সবচেয়ে বর্ষীয়ান ক্রিকেটার, একাধিক রেকর্ড না-গড়ে হয়তো অবসর নেবেন না। (সমাধান ৫৬ পৃষ্ঠায়)

রঞ্জন

হারানো কাকাতুয়া

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

আগে যা ঘটেছে : গবা কি সত্যি পাগল? উদ্ধববাবুর কেনা কাকাতুয়া বলে, "আলমারিতে টাকা নেই, অন্য জায়গায় আছে।" কোথায় আছে, জানবার জন্যে পাখিটিকে অনেকেই হাতাতে চায়। উদ্ধবের ছেলে রামুর গৃহশিক্ষক যুধিষ্ঠির জর্দাপান খায়। গবার ঘরে মধ্যরাতে যে ঢুকেছিল, তার মুখেও জর্দার গন্ধ। কাশিমের চরে হরিহর পাড়ুই খুন হয়; যুধিষ্ঠির তারই ছেলে। খুনের মামলার জেল-পালানো আসামি গোবিন্দ সার্কাসে ছদ্মবেশে খেলা দেখাত। পুলিশের সন্দেহ হওয়ায় সে গা-ঢাকা দেয়, কিন্তু গোপন আশ্রয়ে আগুন লাগে। গোবিন্দ বেঁচে গিয়ে গবার সাহায্যে উদ্ধববাবুর বাড়িতে কাজ পায়। উদ্ধবের লোভী কর্মচারী নয়নকাজলের সহায়তায় কাকাতুয়া ও রামুকে ইতিমধ্যে লুঠ করেছে ডাকাত সাতনা। গোবিন্দকে সঙ্গে নিয়ে গবা যায় কাশিমের চরে, সেখানে ডাকাতের হাতে মরতে-মরতে পালিয়ে আসে। অনুতপ্ত নয়নকাজল ও রামু পালাতে গিয়ে শংকর মাঝির শাকরেদ কিংকরের হাতে ধরা পড়ে। কিংকর তাদের সাতনার হাতে তুলে দেয়। মারবার জন্যে রামুকে ডোবার ধারে আনা হয়েছে। তারপর...

॥ ২৯ ॥

জলার ধারে যখন এই ঘটনা ঘটছে, তখন একটু দূরে ঈশান কোণে একটা ভাঙা মন্দিরের উঁচু চাতালে দাঁড়িয়ে দুজন লোক দৃশ্যটা দেখছিল। আসলে দৃশ্যটা খুব মন দিয়ে দেখছিল একজন। সে কিংকর। আর দ্বিতীয় লোকটি অর্থাৎ সাতনা লক্ষ করছিল কিংকরকে।

রামুর ঘাড়ের ওপর উদ্যত ভোজালিতে রোদ ঝিকিয়ে উঠতেই কিংকর আর সহ্য করতে পারল না। হাতের বল্লমটা চোখের পলকে তুলে শাঁ করে ছুঁড়ে দিল। এত দূর থেকে বল্লম যত জোরেই ছোঁড়া হোক, তা পৌঁছনোর কথা নয়। তাছাড়া নিশানা ঠিক রাখার তো প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু কিংকরের জাদু-হাত যেন বল্লমটাকে মন্ত্রঃপূত করে ছুঁড়ল। সেটা রোদে ঝিলিক হেনে হাউইয়ের মতো তেড়ে গিয়ে খুনেটার বাঁ কাঁধে বিঁধে গেল। ভোজালি ফেলে 'বাপ রে' বলে চেঁচিয়ে লোকটা মাটিতে পড়ে ছটফট করতে থাকে।

সাতনা এতটুকু চঞ্চল হল না। শুধু প্রকাণ্ড একখানা হাত বাড়িয়ে কিংকরের পিঠটা চাপড়ে দিয়ে বলল, "শাবাশ। বহোত খুব।"

কিংকর এই বাহবায় গলল না। চিতাবাঘের মতো ঘুরে দাঁড়িয়ে ধমক দিয়ে বলল, "তোমরা ডাকাত না ছুঁচো? কাপুরুষের দল! বাচ্চাদের যারা খুন করে, তারা কখনো মরদ নয়।"

সাতনা একটু হাসল। তারপর মোলায়েম গলায় বলল, "রামুকে খুন করা হত না হে। তোমাকে একটু পরীক্ষা করার জন্য ওটুকু অভিনয় করতে হল।"

কিংকর ফুঁসে উঠে বলে, "কিসের পরীক্ষা? তোমাদের মতো চুনোপুঁটির কাছে পরীক্ষা দিতে হবে, আমাকে তেমন ঠাউরেছ নাকি?"

সাতনা ঠাণ্ডা গলায় বলে, "আহা চটো কেন ভায়া! তুমি ভিন্ দলের লোক না শত্রুপক্ষের চর তা একটু বাজিয়ে দেখতে হবে না?"

কিংকর চোখ রাঙা করে তেজের গলায় বলল, "দেখ সাতনা, যতদূর জানি তুমি এ-দলের সামান্য মোড়ল মাত্র। সর্দার তান্ত্রিকবাবা কাল তোমাকে তেমন পাত্তা দিচ্ছিল না। বেশি ফোঁপরদালালি করবে তো সোজা সর্দারকে জানিয়ে দেব। আর একটা কথা, তোমার চেহারাটা বড়সড় বটে, তা বলে ভেবো না বেড়ালের মতো তোমার নটা প্রাণ আছে। এই দুখানা শুধু-হাতে তোমার ওই মোষের গর্দান ভেজা-গামছার মতো নিংড়ে মুচড়ে দিতে পারি। কাজেই বুঝে-সমঝে চলো। আমি তোমার পালের মেড়াদের মতো নই।"

সাতনার সঙ্গে এই ভাষায় এবং তেজের ভঙ্গিতে কেউ কথা কওয়ার সাহস পায় না। কিন্তু এই অগ্রাহ্যের ভাব সাতনা মুখ বুজে সয়ে গেল। শুধু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "আমি একটা ছেলেকে চিনতাম। তখন তার অল্প বয়স। ইসকুলে পড়ে। প্রতি বছর ইসকুলের স্পোর্টসে ছেলেটা জ্যাভেলিন থ্রোয়ে সেরা প্রাইজ পেত। বর্শা ছুঁড়ত এমন জোরে যে দেখে

তাক লেগে যেত। বেঁচে থাকলে এখন সে তোমার বয়সীই হয়েছে।"

এ-কথা শুনে কিংকর একটু অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। তবু তেজের সঙ্গে বলল, "ওসব এলেবেলে কথা শুনতে চাই না। এবার থেকে কিংকরকে একটু সমঝে চলো।"

দুজন লোক বল্লম-খাওয়া লোকটাকে ধরাধরি করে চাতালে এনে ফেলল। মুখে জল দেওয়া হচ্ছে। রক্তে ভাসাভাসি কাণ্ড। চোট গুরুতর। তবে কাঁধে লেগেছে বলে প্রাণের ভয় নেই। সাতনার স্যাঙাতরা কটমট করে কিংকরের দিকে তাকাচ্ছে। একটু ইঙ্গিত পেলেই ঝাঁপিয়ে পড়ে গলা নামিয়ে দেবে।

কিন্তু সাতনা তাদের দিকে তাকাল না। কিংকরকে বলল, "চলো, ভিতর-বাড়িতে যাই। ভয় নেই, রামুকে কেউ এখনই খুন করবে না।"

কিংকর বলল, "না-করাই বুদ্ধিমানের কাজ। ওই বাচ্চা-ছেলেটার গায়ে কেউ হাত তুলেছে বলে যদি টের পাই তবে সেই হাত আমি কেটে ফেলে দেব। মনে রেখো।"

"বাপ রে!" বলে সাতনা হাসল, "তুমি যে আমাকে ভয় খাইয়ে দিচ্ছ।"

এ-কথায় কিংকরও হেসে ফেলল। তারপর ভিতরবাড়িতে গিয়ে উঠোনের রোদে দুজনে দুটো দড়ির চারপাইতে বসে খেজুর-রস খেতে লাগল। কিংকর জিজ্ঞেস করল, "হঠাৎ আমাকে পরীক্ষা করার জন্য ওই ছেলেটাকে সাতসকালে খুনেদের হাতে ছেড়ে দিয়েছিলে কেন?"

সাতনা প্রথমটায় কথা বলল না। একমনে খেজুর-রস খেয়ে যেতে লাগল। অনেকক্ষণ বাদে বলল, "দেখছিলাম ওই ছেলেটার প্রতি তোমার দরদ আছে কি না।"

কিংকর অবাক হয়ে বলল, "থাকবে না কেন? ডাকাতি করি বলে তো আর অমানুষ নই।"

সাতনা একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, "তোমাকে যে সেই ছেলেটার কথা বলছিলাম, যে ইসকুলে জ্যাভেলিন থ্রোতে প্রতিবার ফার্স্ট হত, তার কথা আর একটু শুনবে নাকি?"

কিংকর একটু থতমত খেয়ে বলে, "তার মানে? তোমার কি মাথার গণ্ডগোল আছে নাকি বাপু? হঠাৎ পুরনো গপ্পো ফেঁদে বসতে চাইছ কেন?"

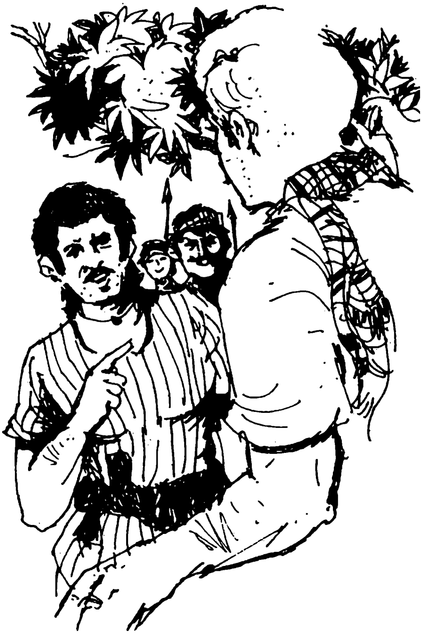

"সাধে কি আর চাইছি? গপ্পোটা তোমার জানা দরকার। এমনও তো হতে পারে যে, সেই ছেলেটাই তুমি।"

কিংকর হাতের রসসুদ্ধু ভাঁড়টা হঠাৎ ছুঁড়ে ফেলে উঠে দাঁড়াল। তার চোখ ধকধক করছে, লম্বা শরীরের পেশীগুলো জামার তলায় ঠেলাঠেলি করছে। থমথমে গলায় সে বলে, "সাতনা, বুঝতে পারছি খামোখা আমাকে ঝামেলায় জড়িয়ে, সকলের মনে সন্দেহ জাগিয়ে তুমি আমাকে দল থেকে হঠাতে চাইছ। কারণ আমি থাকলে এই দলে তোমার জায়গা আমার নীচেই হবে। তাই বলছি, ওসব হীন চক্রান্ত না করে এসো দুজনে মরদের মতো ফয়সালা করে নিই কে কত বড় ওস্তাদ। হাতিয়ার ধরতে হয় তো ধরো, নইলে খালি-হাতে চাও তো তাই হোক। চলে এসো।"

এই চ্যালেনজের জবাবে কিন্তু সাতনা নড়ল না। কেমন একরকম ক্যাবলা চোখে কিছুক্ষণ কিংকরের দিকে চেয়ে থেকে মাথা নেড়ে বলল, "বোসো কিংকর। না, তোমার সঙ্গে আমি কাজিয়া করতে চাই না। বোসো, কথা আছে।"

রাগে ফুলতে-ফুলতে কিংকর আবার চারপাইতে বসল।

সাতনা বলল, "তুমি খুব সাংঘাতিক লোক, মেনে নিচ্ছি। কিন্তু মনে রেখো, তোমারও একটা বৈ দুটো প্রাণ নেই।"

"তা জানি। ওসব ভয় আমাকে দেখিও না। কিংকরের একটাই জান বটে, কিন্তু সেটা মরদের জান। তোমার মতো জান নয়। আমাকে প্রাণের ভয় দেখিয়ো না।"

এতেও উত্তেজিত হল না সাতনা। শান্ত গলায় বলল, "তোমাকে ভয় দেখিয়ে লাভ নেই জানি। সে-চেষ্টা করছি না। শুধু জানতে চাইছি তুমি এ-দলে ঢুকলে কেন? তোমার মতলবখানা কী?"

"সে যাই হোক, সর্দার বুঝবে। তুমি তোমার মতো থাকো।"

সাতনা মাথা নেড়ে বলে, "তা থাকতে পারছি কই? তুমি কথায়-কথায় আমাকে শাসাচ্ছ, লড়তে চাইছ। তার মানে ছুতোনাতায় আমার সঙ্গে তোমার লাগবেই। তাই মনে হয় তুমি আমাকে ভাল চোখে দেখতে পারছ না।"

কিংকর গম্ভীর গলায় বলে, "ভদ্রলোকের মতো ব্যবহার করলে ভাল চোখে দেখতে বাধা কী?"

সাতনা বলে, "বাধা আছে। তোমার বাধা আছে। আমার সব কিছু মনে থাকে। মানুষের মুখ আমি সহজে ভুলি না।"

কিংকরের মুখটা আবার হিংস্র হয়ে ওঠে।

সাতনা হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিয়ে বলে, "কিছু বলতে হবে না। আমি মরদ কিনা সে-পরিচয় যথাসময়ে পাবে। এখন খ্যামা দাও। শুধু মনে রেখো, সাতনার দশজোড়া চোখ সব জায়গায় তোমাকে নজরে রাখবে। দশজোড়া হাত তৈরি থাকবে। এক চুল বেয়াদবি দেখলে চোখের একটা ইশারা করব, সঙ্গে-সঙ্গে তোমার মুণ্ডু খসে পড়বে।"

কিংকর ঝাঁকুনি মেরে উঠতে যাচ্ছিল। কিন্তু বাস্তবিকই পিছন থেকে আচমকা দশখানা বল্লমের তীক্ষ্ণ ডগা তার পিঠ আর কোমর স্পর্শ করল। কিংকর উঠল না। কিন্তু একটু তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বলল, "খুব মরদ!"

সাতনা খুব বড় একটা শ্বাস টেনে বলল, "তোমার সাহস আছে বটে।"

(ক্রমশ)

ছবি : দেবাশিস দেব

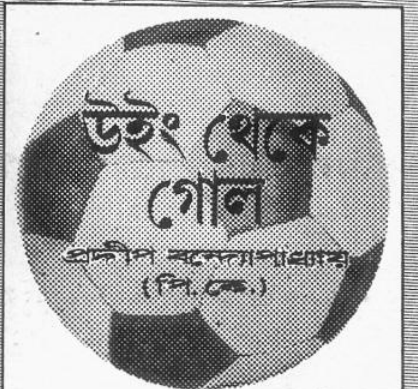

॥ ৩৬ ॥

উনিশশো আটান্ন সালের আন্তঃরেল ফুটবল প্রতিযোগিতার একটি গোলের কথা আলাদা করে বলা উচিত।

সেই সময়ে, ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গোলরক্ষক ছিলেন সেনট্রাল রেলওয়ের সঞ্জীব। শিকারি বিড়ালের মতো ক্ষিপ্রতা ছিল তাঁর। একই ধরনের ক্ষিপ্রতা ছিল বাংলার রবীন নান্টা গুহর।

যাই হোক, আন্তঃরেল ফুটবলের কোয়ার্টার ফাইনালে আমাদের সঞ্জীবের মুখোমুখি হতে হল। পরপর আমার দুটো শট বাঁচিয়ে বললেন, "কী হল, পারলে না তো? আজ পারবে না!"

এই ধরনের কথা শুনে তখন আমরা মোটেই মাথা গরম করতাম না। কিছুক্ষণ পর, ডান দিকে একটা বল পেলাম। এগিয়ে সেণ্টার করতে গিয়ে দেখি, সঞ্জীব ঝড়ের গতিতে ছুটে এসে ঠিক জায়গা নিচ্ছেন। শট নেওয়ার সময় ফুটবলারকে অল্পক্ষণের জন্য বলের দিকে তাকাতেই হয়। সঞ্জীব ঐ সময়টুকুরও সদ্ব্যবহার করতেন। ব্যাপারটা বুঝলাম।

এবার বল বাড়ালেন দিনু দাস। বাঁ পায়ের আউটসাইড ডজে ওদের রাইট ব্যাককে কাটিয়ে, বাঁ পায়েই প্রচণ্ড শট নিতে গেলাম। সঞ্জীব যথারীতি এগিয়ে জায়গা ছোট করে ফেললেন। আমি পা না থামিয়ে, ঐ একই অ্যাকশনে, বলের নীচে পা ঢুকিয়ে আস্তে বল তুলে দিলাম। মাথার ওপর দিয়ে বল গোলে ঢুকল, সঞ্জীব অসহায় দৃষ্টিতে দেখলেন।

তারপর হাততালি দিতে দিতে এগিয়ে এসে

বললেন, "একেই বলে গোল! এখন মানলাম, তুমি ভাল প্লেয়ার।" রাত্রে, নৈশভোজের আসরে বললেন, "আজ মন ভরে গেল। অনেক বড় প্লেয়ারের সঙ্গে খেলেছি। আমাকে এভাবে বোকা বানিয়ে কেউ গোল করেনি। ভাবতে ভাল লাগছে, ভারতীয় রেলে এমন খেলোয়াড় আছে।"

সেবার সন্তোষ ট্রফির মূল আসর বসার কথা মাদ্রাজে। কিন্তু প্রাথমিক পর্যায়ে খেলার জন্য প্রথমে যেতে হল আসামের জোড়হাটে। আমাদের অধিনায়ক—সালাম। কোচ—অরুণ সিন্‌হা।

খেলার আগের দিন জোড়হাটে পৌঁছলেও, একটুও প্র্যাকটিস করা গেল না। প্রবল বৃষ্টি।

কোচ অরুণ সিন্‌হাকে (ভুভুদা) আমাদের খুব পছন্দ হল। মোহনবাগানের সেণ্টার-ফরোয়ার্ড ভুভুদাকে উনিশশো সাতচল্লিশ সালে খেলা ছাড়তে হয় গুরুতর আঘাতের জন্য। একবার মেওয়ালাল থাকা সত্ত্বেও তিনি বাংলার সেণ্টার-ফরোয়ার্ড হিসেবে খেলেছিলেন। মেওয়াদাকে রাইট-ইনসাইডে দেওয়া হয়েছিল!

অল্পবয়সী ভুভুদা কোচ হিসেবে জনপ্রিয় হয়ে গেলেন তাঁর চমৎকার ব্যক্তিত্বের গুণে। শাসন করতেন কম; যেন বন্ধুর মতো। ফুটবলারদের মনস্তত্ত্ব বুঝতেন।

সারা রাত বৃষ্টি হল। আমি আর চুনী একই ঘরে। কখন সকাল হয়ে গেছে, গভীর ঘুমের ঘোরে টের পাইনি। ম্যানেজার সরোজ বসু আমাদের ঘরে ঢুকেই দুজনকে 'কুম্ভকর্ণ' উপাধি দিলেন।

তারপর সকলে মিলে মাঠ দেখতে গেলাম। কোথায় মাঠ, এ তো পুকুর! আট-দশটা পাম্প চালু করা হয়েছে। বিকেলে নাকি খেলা হবেই।

খেলা সত্যিই হল। মাঠে কিছু জল থাকলেও কাদা ছিল না। আমাদের দুর্ধর্ষ ফরোয়ার্ড লাইনের (পি কে, রহমতুল্লা, দামোদরন, চুনী ও বলরাম) সামনে আসামের রক্ষণভাগ দাঁড়াতেই পারল না। চুনী, বলরাম, রহমতুল্লা এবং আমার গোলে বাংলা চার গোলে এগিয়ে গেল।

খেলা শেষ হওয়ার মিনিট দশ-বারো আগে কেম্পিয়া ব্যাকপাস করলেন আমাদের গোলকীপার প্রদ্যোৎ বর্মনের দিকে। ফুটবলের

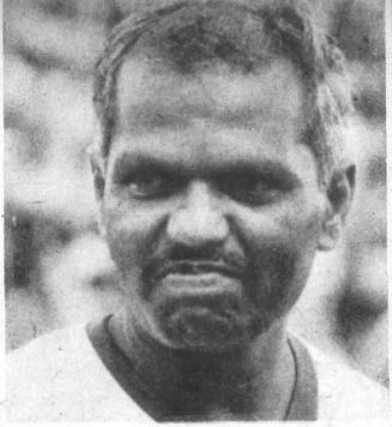

বলরাম

পরিভাষায় যাকে বলে '৫০—৫০ বল'। তার ওপর, জলে বল আটকে গেল। বর্মন ঝাঁপালেন, আসামের সেণ্টার ফরোয়ার্ড শট নিলেন। কিন্তু তাঁর পা বলের বদলে বর্মনের মুখে লাগল।

খেলায় এই ধরনের পরিস্থিতি মাঝে-মাঝে আসে। গোলকীপারকে বাঁচানোর জন্য যখন ফরোয়ার্ডদের গোল করার সুযোগ হাতছাড়া করতে হয়। আমি এইরকম অবস্থায় বল নিয়ে পাশে সরে যেতাম, অথবা গোলকীপারের ওপর দিয়ে লাফিয়ে চলে যেতাম। তোমাদের অনেকের মনে থাকতে পারে, মোহনবাগান আর কসমসের খেলার দিনে পেলেও ঠিক এমনিভাবে শিবাজি ব্যানার্জির ওপর দিয়ে লাফিয়ে চলে গিয়েছিলেন।

প্রথমে ছুটে গেলেন কেম্পিয়া। তারপর সালাম। কিন্তু বর্মন আর ওঠেন না। আমরা সকলেই ছুটে গিয়ে দেখি, বর্মনের শরীর একটুও নড়ছে না, চোখের নীচে গভীর ক্ষত, ফিনকি

পি. বর্মন

দিয়ে রক্ত পড়ছে। চুনী আর্তনাদ করে উঠল, "বর্মন মরে গেছে!"

অচেতন প্রদ্যোৎ বর্মনকে নিয়ে গেলেন আমাদের ডাঃ এস দাশগুপ্ত, যিনি ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে খেলতেন।

তখনও খেলোয়াড় বদলের নিয়ম চালু হয়নি। তাহলে, বাকি দশ-বারো মিনিট বাংলার গোলে কে দাঁড়াবে? প্র্যাকটিসে আমিই সেরা বদলি গোলকীপার ছিলাম। কিন্তু বলরাম বলে উঠলেন, "আমি গোলে খেলব।"

গোটা মাঠের হাততালি কুড়িয়ে, দু'নম্বর জার্সি-গায়ে গোলে দাঁড়ালেন বলরাম। বললেন, "দ্যাখো-না, কেমন ডাইভ দিই!" দুর্ভাগ্য বলরামের, তেমন বল আদৌ না আসায় ডাইভ দেওয়ার সুযোগ পাননি। শুধু গোটা-তিনেক ব্যাকপাস তাঁর হাতে গেল। তবে, একটা কথা তোমাদের জানাই, তিনবারই বলরামের ভলি নির্দিষ্ট খেলোয়াড়ের একেবারে পায়ে এসে পড়েছিল।

ডিব্রুগড়ে একটা প্রদর্শনী ম্যাচ খেললাম। সেন্টার ফরোয়ার্ড—ডুডুদা (অরুণ সিন্‌হা)।

মণিমেলার খবর

সম্প্রতি আকাদেমি অব ফাইন আর্টস গ্যালারিতে মণিমেলা মহাকেন্দ্রের উদ্যোগে শিশুদের আঁকা ছবি ও হাতের কাজের একটি প্রদর্শনী হয়। প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন শিল্পী রথীন মৈত্র। তিনদিনের এই প্রদর্শনীতে বেশ ভিড় হয়েছিল। শুভ্রাংশু করের 'ব্যাটলশিপ", সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রিক্সাওয়ালা', সাবেরুল্ গণির 'মহরম' এবং ফিরোজ খান ও মৌসুমি ঘোষের ছবি সকলের প্রশংসা অর্জন করে। মণিমেলার বার্ষিক সাধারণ সভা অধ্যক্ষ প্রশান্তকুমার বসুর সভাপতিত্বে প্রজ্ঞানানন্দ হলে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়।

ক্রিকেট-শব্দ-সন্ধানের সমাধান

পাশাপাশি: (১) পাতৌদি। (২) গ্রেভনি। (৩) কপিলদেব। (৭) হাটন। (৮) মাঁকড়।

উপর-নীচ: (১) পাতিল। (৩) নিসার। (৪) টনি লক। (৫) কম্পটন। (৬) বয়কট।

আমরা নয় গোলে জিতলাম। ডাবল হ্যাটট্রিকসহ আমার গোলের সংখ্যা সাত।

এর পরের প্রতিদ্বন্দ্বী বিহার। খেলা জামশেদপুরে। আমার নিজের জায়গা। পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হল। বিহার দলের টাটা রাও, রমজান, অবধেশ প্রসাদ এবং আরও দু-একজনের সঙ্গে আগে খেলেছি। এই ম্যাচে রহমতুল্লার বদলে টীমে এলেন বাংলার উদীয়মান রাইট-ইনসাইড অসীম সোম।

গোল করে বিহারই এগিয়ে গেল। আমরা একের পর এক সুযোগ নষ্ট করলাম। আমার দুটো শট বারে লাগল।

জামশেদপুরের মানুষের গর্ব, জামশেদপুরের মাঠে ওদের হারানো খুব কঠিন। উনিশশো বাহান্ন সালে হেলসিঙ্কি অলিম্পিকগামী ভারতীয় দল জামশেদপুর একাদশের সঙ্গে খেলা ড্র রেখেছিল, বাড়তি সময়ে সাত্তার গোল শোধ করায়।

বংলা কি তাহলে হেরেই যাবে? খেলা শেষ হওয়ার ঠিক এক মিনিট আগে আমরা একটা ফ্ল্যাগ কিক পেলাম। কে ফ্ল্যাগ কিক নিলেন মনে নেই, তবে আমরা সকলেই ঝাঁপিয়ে পড়লাম। ডান পায়ে চমৎকার ভলি নিয়ে গোল করলেন অসীম সোম।

শেষ পর্যন্ত অবশ্য আমরাই মাদ্রাজে সন্তোষ ট্রফির মূল আসরে গেলাম। তিন মাস পরে।

তার আগে, বোম্বাইয়ে ভারতীয় দলের হয়ে খেললাম বুলগেরিয়ায় জাতীয় দলের বিরুদ্ধে। প্রচণ্ড লড়েও আমরা হেরে গেলাম ৩—৪ গোলে। খেলা শুরু হতেই ডান দিকের দুরূহ কোন থেকে শট নিয়ে ভারতীয় দলের পক্ষে প্রথম গোল করলাম। কিন্তু পাঁচ মিনিট পর সেই গোল শোধ হয়ে গেল। হাফ টাইমের এক মিনিট আগে দ্বিতীয় গোল করে বুলগেরিয়া এগিয়ে গেল। সেন্টার থেকে বল পেয়েই গোলের মুখে বল মারলাম। পড়তি বলে ভলি নিয়ে গোল করলেন আমাদের লেফট-ইনসাইড চার্ল্‌স। ২—২।

দ্বিতীয়ার্ধে ওরা আবার গোল করল। সেই গোল শোধ করলেন নেভিল ডিসুজা। কিন্তু দুর্দান্ত গোল করে বুলগেরিয়াকে ফের এগিয়ে দিলেন লেফট-ইনসাইড ফরোয়ার্ড ভ্যাসিচেভ। সেই গোল শোধ করার আর সময় ছিল না। (ক্রমশ)

মনোজের তিন সহযাত্রী

অশেষ চট্টোপাধ্যায়

২

মনোজ চোখ ফেরাতে পারছে না। মনের একটা দিক অসাড়। আর একটা দিক প্রাণপণে চেষ্টা করছে চোখের দেখাটা যুক্তিতর্কের চৌহদ্দির মধ্যে এনে তার একটা মানে বের করতে। এতক্ষণ তাহলে আপার বার্থে আর একজন যাত্রী ছিল। ওপরের দিকে তাকায়নি বলে নজরে পড়েনি। লোকটা উপুড় হয়ে শুয়ে বিশাল মাথাটা নীচের দিকে ঝুলিয়ে মনোজকে দেখছে। কামরার ঘোলাটে আলোয় সে-মুখের ভাব দেখলে মনে হয় মনোজের ওপর তার ভীষণ রাগ। পারলে চিবিয়ে খায়। সেই লালচে ভাঁটার মতো দুচোখে চেয়ে আছে তো চেয়েই আছে। পলক পর্যন্ত পড়ছে না।

মনোজের মনের একটা অংশ এতক্ষণ তাকে জাগিয়ে রাখার জন্যে ধস্তাধস্তি করছিল। তারই চেষ্টায় সেই ভয়ংকর চাউনির থেকে নিজের দৃষ্টি ছাড়িয়ে নিয়ে বাইরের দিকে তাকাল মনোজ। সেখানেও অন্ধকারের নিরেট দেওয়াল। সেই গন্ধটা আবার জমাট হয়ে আসছে। কোনও কিছু পচলে যেমন হয়, তেমনি। মনোজের দম আটকে আসছিল।

ট্রেন ছুটছে তো ছুটছেই। পরের স্টেশন আসতে কতক্ষণ লাগবে, কে জানে! মনোজ ঠিক করল ট্রেন মাঠের মাঝখানে থামলেও কামরা বদল করবে। তা সে কামরায় আলো থাকুক আর নাই থাকুক। মনোজের গানের গলা নেই। তবু গুন-গুন করে গাইবার চেষ্টা করল—ও আমার আঁধার ভাল। গলা থেকে বেরোল কতগুলো কাঁপা-কাঁপা আওয়াজ। সে চেষ্টায় দাঁড়ি টানল মনোজ।

ভেবেছিল ওপরদিকে আর তাকাবে না। তার ইচ্ছের ঘাড় মুচড়ে আবার নজর গেল বার্থের দিকে। মুখটা যেন আরও নীচে ঝুঁকে এসেছে। দু চোখের সেই পলকছাড়া চাউনি সঙ্গে সঙ্গে সাপটে ধরল মনোজকে। এই ভাবে এতক্ষণ মাথা ঝুলিয়ে কোনও লোক থাকতে পারে নাকি? কী চায় লোকটা? প্রশ্নগুলো ভেসে উঠতে না উঠতে ডুবে গেল। মনোজ বুঝতে পারল ঘামে তার সারা গা ভিজে যাচ্ছে। শরীর বেয়ে ছড়িয়ে পড়ছে একটা ঠাণ্ডা শিরশিরে ভাব। তবু নজর ফেরাতে পারছে না।

আপার বার্থের যাত্রীর মুখে কোনও কথা নেই। দুবে যেমন গায়ে পড়ে আলাপ করেছিল তেমনি করতে পারে না মনোজ। বুকের মধ্যে ঢাকের বাদ্যি ছাপিয়ে বুদ্ধিটা সোজা হয়ে দাঁড়াল। মনের সবটুকু জোর কুড়িয়ে-বাড়িয়ে

কথা বলার চেষ্টা করল মনোজ। গলা শুকিয়ে কাঠ। কোনও আওয়াজ বেরোল না।

"কাঁহা যাইয়েগা," দ্বিতীয় চেষ্টায় কোনওরকমে কথাগুলো উগরে দিল মনোজ, ফ্যাসফ্যাসে গলায়।

হঠাৎ দুলে উঠল কামরাটা। মনোজের সহযাত্রীর প্রকাণ্ড মাথাটা এদিক-ওদিক নড়ে একটা মস্ত না বলল।

গলা আর মুখের মধ্যে গাদাগুচ্ছের শিরীষ কাগজের টুকরো। অসহ্য গরম, প্যাচপেচে ঘাম আর সেই পচা গন্ধটা মনোজকে জলতেষ্টার কথা মনে করিয়ে দিল। পাশেই প্লাস্টিকের জলের বোতল। এক চুমুকে অর্ধেক বোতল সাফ। জল তেতে গেছে, তায় আবার প্লাস্টিকের গন্ধ। তেষ্টাটা আরো জেঁকে বসল।

মনোজ মরিয়া হয়ে জলের বোতলটা তুলে ধরল ওপর দিকে। জিজ্ঞেস করল সহযাত্রীকে, "পানি পিয়েগা আপ?"

আবার সেই বিশাল মাথাটা ঘাড় নেড়ে না বলল। ওই মাথার মালিক ঘাড় হেঁট করে চুপচাপ তাকিয়েই থাকবে মনোজের দিকে। সেই ময়াল সাপের মতো ঠায়-তাকানো চোখে চুম্বকের টান। সারা শরীর ঘেন্নায় পাক দিয়ে উঠলেও নিস্তার নেই সে টান থেকে। মনোজ বুঝতে পারল সেই ঠাণ্ডা শিরশিরে ভাবটা চাইছে তাকে তলিয়ে দিতে। হাতে-পায়ে যেন জগদ্দল বাটখারা বাঁধা। জোরজার করে সিগারেটের প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট নিয়ে ঠোঁটে চাপল। বুক-পকেট থেকে দেশলাই বার করে জ্বালতে গিয়ে দেখল হাত কাঁপছে। দেশলাই কিন্তু জ্বলল না। ঘামে বারুদ ভিজে অকেজো হয়ে গেছে। গাড়ির ঝাঁকুনিতে সিগারেটটা টুপ করে পড়ে গেল কামরার মেঝেয়। লক্ষ করল না মনোজ।

হঠাৎ আকাশ-বাতাস ফালা-ফালা করে ইঞ্জিনের হুইশ্‌ল্, সঙ্গে সঙ্গে গুমগুম শব্দ করে একটা ব্রিজকে মাড়িয়ে যেতে থাকল ট্রেনটা। হু-হু করে ইঞ্জিনের ধোঁয়া ঢুকতে লাগল জানলা দিয়ে। কামরাটা দুলতে লাগল এপাশ-ওপাশ। মনোজের মনের ওপর একটা অন্ধকার ঢাকনা নেমে আসছে। পুরোপুরি চাপা পড়ার আগে মনোজের মনে হল ট্রেন বুঝি আর থামবে না। কিংবা, একেবারে নরকে গিয়ে থামবে। মনোজের চিবুক বুকের মধ্যে গোঁজা। হাতদুটো একদম ঢিলে। ছড়ানো দু-পায়ের মধ্যে অনেকখানি ফাঁক। ঠোঁট থেকে খসে-পড়া সিগারেটটা কামরার মেঝেতে গড়িয়ে বেড়াচ্ছে। গুমগুম শব্দ, তার সঙ্গে কামরার দোলানির আর শেষ নেই।

মনোজ বুঝতে পারল নিজেকে সে আর জাগিয়ে রাখতে পারবে না। অন্ধকারের মখমলে মুড়ি দিয়ে তলিয়ে যেতে পারলে নিশ্চিন্ত। কামরাটা আবার ভীষণ জোরে দুলে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে ধপ্ করে একটা শব্দ ছোট কামরার মধ্যে বোমা হয়ে ফাটল। মনোজের সহযাত্রী এক লাফে মেঝের ওপর পড়ল। কিন্তু ঠাস করে মুখ থুবড়ে। লোকটা সজোরে পড়েও নড়ল না। মুখে টুঁ শব্দটিও নেই। পড়ার সময় একটা মস্ত হাতের পাঞ্জার তলায় মনোজের বাঁ পায়ের জঙ্গল-বুটের ডগাটা চাপা পড়েছিল। সেই থাবার মধ্যে পাটা ধরাই থাকল।

মনোজের জেগে থাকার বাতিগুলো প্রায় সবই নিবে গিয়েছিল। একটা শুধু জ্বলছিল টিমটিম করে। সেটারও এবার অন্ধকারে ঢাকা পড়ার কথা, কিন্তু পড়ল না। সেই সামান্য সাড়ে মনোজ তার বাঁ-পাটা মস্ত পাঞ্জার মুঠো থেকে ছাড়িয়ে আনল। যুক্তি দিয়ে সব কিছু বোঝার ক্ষমতা ভোঁতা হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। অন্ধকারের ভারী পর্দায় দুটো ছোট কুটো মনোজের দু-চোখ। দেখতে পাচ্ছে একটা রীতিমত জোয়ান চেহারার লোক উপুড় হয়ে পড়ে। খালি গা। চওড়া কালো পিঠ। হাঁটু পর্যন্ত ময়লা ধুতি পরা। গলাটা অস্বাভাবিক লম্বা। সেই পচা গন্ধটা এখন হাত দিয়ে যেন ছোঁয়া যায়।

কতক্ষণ একনাগাড়ে তাকিয়ে বসে ছিল খেয়াল নেই মনোজের। হঠাৎ টের পেল, ট্রেনটা আর চলছে না, থেমে আছে। একটু-একটু করে হুঁশ ফিরে এল। কামরার মধ্যে খাকি পোশাক-পরা জনা-তিনেক লোক। তারাও দেখছে, একবার মনোজকে, আর একবার তার সহযাত্রীকে।

"এ সাব, কেয়া হুয়া আপকো," ভারী একখানা হাত মনোজের কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিল।

"ভয় পেয়েছেন বোধহয়," হিন্দিতে বলল আর একজন।

মনোজ আস্তে-আস্তে বুঝল খাকি পোশাক-পরা লোকগুলো পুলিশ কনস্টেবল। অন্ধকারের পর্দাটা আরও গুটিয়ে গেল।

"ইয়ে আদমি কৌন হ্যায়," নিজেকে সামলে নিয়ে অনেকক্ষণ পরে কথা বলল মনোজ।

"আদমি কোথায়," হিন্দিতে জবাব দিল মাঝবয়েসি হাবিলদারটি, "এ তো ইউ. ডি কেসের লাশ।"

ইউ. ডি. কেস অর্থাৎ আনন্যাচারাল ডেথ কেস, থাকে বলে অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা। মনোজের পুলিশি বিদ্যেয় মানেটা পরিষ্কার। ব্যাপারটা চট করে বুঝেই এতক্ষণ কুঁকড়ে-থাকা মনোজের মনের মধ্যে একটা প্রচণ্ড রাগ মুঠো পাকাতে লাগল। সে রাগটা নিজের বোকামির জন্যেও।

"লাশ," মেজাজ দেখিয়ে বলল মনোজ, "আমার কামরায় কেন আপনারা ইউ. ডি. কেসের লাশ পুরে দিয়েছিলেন?"

"গুসসা হচ্ছেন কেন সাব," হাবিলদারটি একরকম মাপ চাওয়ার ভাব করে বলল, "গলায় দড়ির কেস। সদরে নিয়ে যেতে হবে পোস্টমর্টেমের জন্যে। অন্য কামরায় প্যাসেঞ্জাররা আপত্তি করল তো ফাঁকা দেখে এই ফার্স্ট ক্লাস কামরার ওপরের বার্থে রেখে দিয়েছিলাম। মাঝ-রাস্তায় সেই কামরায় যে আপনি চড়বেন তা আমরা বুঝব কী করে। তারপর গাড়ির ঝাঁকুনিতে বোধহয় ওপর থেকে লাশটা পড়ে গিয়ে থাকবে।"

মনোজ এবার হেসে ফেলল। হিন্দিতে কী যেন বলে—বুদ্ধু না বেকুব — সে হচ্ছে ঠিক তাই একটি। মনোজকে হাসতে দেখে হাবিলদারটি তাড়াতাড়ি বলল, "আমরা এক্ষুনি লাশ নামিয়ে নিচ্ছি। আপনি আরো দূরে যাবেন তো? এই কামরাতেই চলে যান।"

রক্ষে করো, মনোজ বলল মনে মনে। স্যুটকেস আর জলের বোতল দু-হাতে, ম্যাগাজিনটা বগলদাবা, মনোজ নামার আগে হাবিলদারকে বলল, "মুর্দার গন্ধে কামরা ভরে গেছে। আমি অন্য কামরায় চললাম।" বলেই নেমে পড়ল।

"সাব, আপনার সিগারেটের প্যাকেট," পেছন থেকে হাবিলদার বলল ডেকে। সেই দুবের দেওয়া সিগারেটের প্যাকেট।

"ও আপনারাই নিয়ে নিন," যেতে যেতে বলল মনোজ।

পাশের কামরায় আলো নেই এবং কাঠের বেঞ্চ। তবে লোক আছে, যদিও ভিড় নেই। স্টেশন থেকে ছিটকে-আসা আবছা আলোয় একটা ফাঁকা জায়গা দেখে বসে পড়ল মনোজ। জানলার দিকে হাত এগিয়ে ঘড়ি দেখল—পৌনে আটটা। আর বড় জোর ঘণ্টাখানেকের মামলা।

দুবের দেওয়া ডানহিলের প্যাকেট তো দান করে এসেছে। এবার বেশ জম্পেশ করে নিজের ব্রাণ্ডের একটা সিগারেট ধরানো যেতে পারে। পকেট থেকে দোমড়ানো নাম্বার টেনের প্যাকেট বের করল মনোজ। দেশলাই জ্বালতে গিয়ে দেখল সেই যে ঘামে ভিজেছিল তাতেই দেশলাইয়ের বারুদের বারোটা বেজে গেছে। দু'চার বার কাঠি ঠুকতে গিয়ে কাঠিই শুধু ভাঙল না, বারুদের দিকটা ছিঁড়েও গেল।

সামনের বেঞ্চে বসা আর একটা লোক সিগারেট ধরাচ্ছিল। মনোজের দেশলাইয়ের হাল দেখে আগুনটা দু-হাতের তেলোয় আগলে সামনে এগিয়ে ধরল। মনোজ ধরাল সিগারেট। দেশলাইয়ের একরত্তি আলোয় লোকটার মুখ কেমন যেন চেনা-চেনা মনে হল। অথচ এ-রকম চেহারার কোনও লোক দেখেছে বলে মনে করতে পারল না। সিগারেটে একটা লম্বা টান দিতেই মনোজের মাথার মধ্যে একটা আলোর ঝিলিক। আরে, এই লোকটার খোঁজেই না তার এত কষ্টের দুধিয়াগাঁও অভিযান। স্যুটকেশের মধ্যে রাখা ফোটোর সঙ্গে এইমাত্র মনোজকে যে আগুন এগিয়ে দিল তার চেহারার আশ্চর্য মিল।

লোকটার নিজের সিগারেটটাই ঠিকমতো ধরেনি। নিবে গিয়েছিল। আবার জ্বলল দেশলাই। এবার ভাল করে দেখল মনোজ। না, ভুল হয়নি, ইনিই তিনি। কত অজানারে জানাইলে তুমি, মনে মনে ভেঁজে নিল মনোজ।

"আপ কাঁহা যাইয়েগা," খুব মিষ্টি করে মনোজ জিজ্ঞেস করল তার তিন নম্বর সহযাত্রীকে। অন্ধকারে ওর হাসিটা আর কেউ দেখতে পেল না।

ছবি দেবাশিস দেব

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

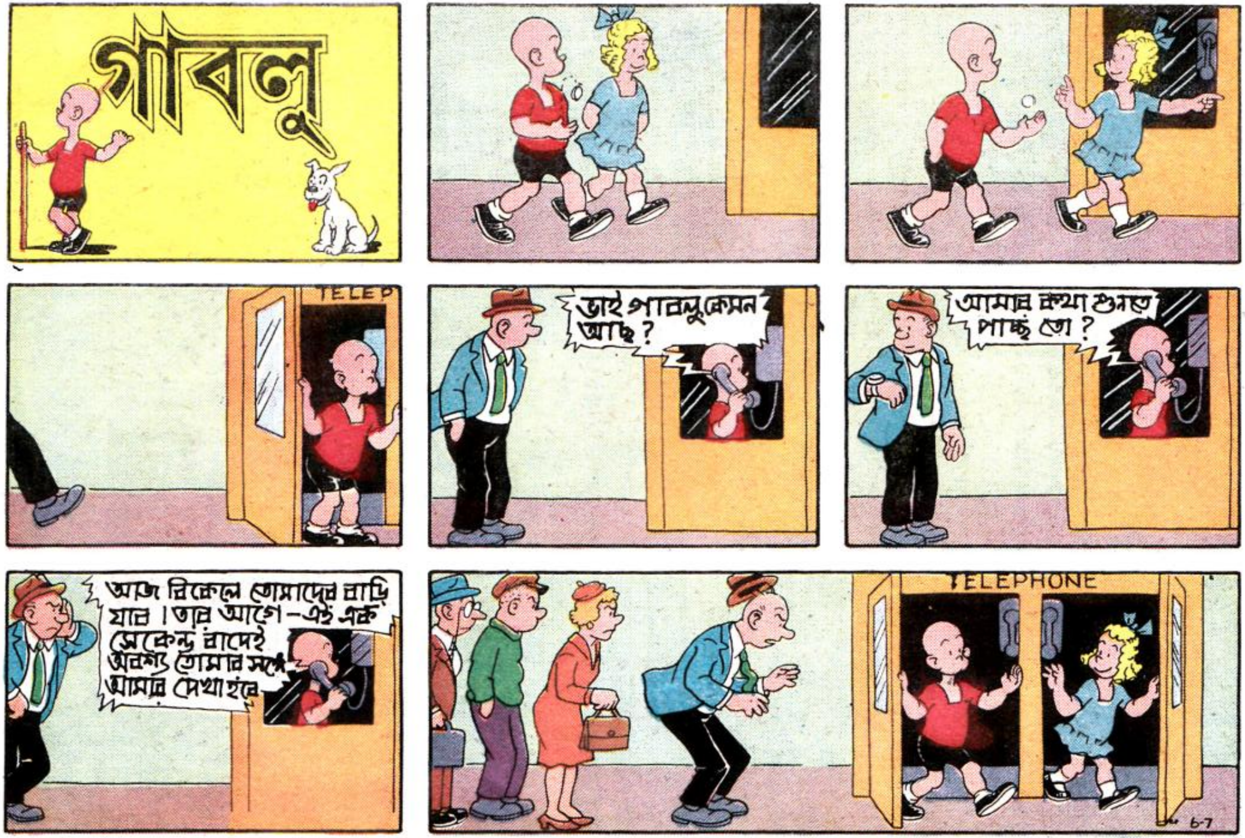
গাবলু
TELEP
ভাই গাবলু কেমন আছ ?
আমার কথা শুনতে পাচ্ছ তো ?
আজ বিকেলে তোমাদের বাড়ি যাব। তার আগে—এই এক সেকেন্ড বাদেই অবশ্য তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে
TELEPHONE

মাঝখানে দম ফুরিয়ে

বাচস্পতি

চাইনিজ খাওয়া সেদিন ভালই হয়েছিল, অন্তত হিগিনকাকুর পক্ষে। তিনি হাপুস-হুপুস করে, মুখচোখের মুগ্ধ ভঙ্গি করে, খাবার নিজেই চারভাগের তিনভাগ খেয়ে নিলেন প্রায়। তারপর ঐ মুগ্ধ ভাবটা যখন চোখের পাতায় ঘুমের চেহারা নিয়ে ভারী হয়ে এল তখন 'রাধা' বলে একটা হুংকার দিয়ে পরপর দু-কাপ কালো কফি খেলেন, তারপর ভণ্টু আর তার বাবার সঙ্গে আবার বসবার ঘরে চলে এলেন। বারবার বলতে লাগলেন, "বৌদি, চাইনিজ রান্নার এই হাত, এটা তোমার ঈশ্বরের দান। আজেবাজে ডালভাত রেঁধে ও হাতের অপমান কোরো না!"

বাবা জিজ্ঞেস করলেন, "এবার বলো, গ্রন্থ, ত্রস্ত, গ্রহ, ক্রন্দন—এই যে শব্দগুলো, এগুলোতে প্রথমে তো 'ও' পাচ্ছি উচ্চারণে, গ্রো, ত্রো, ক্রো—। কিন্তু তার পরের ও-টা — অর্থাৎ ঐ - ন্থো, - স্তো, - হো, - ন্দো — সেটা কোত্থেকে আসছে? বানানে তো ও-কার নেই।"

হিগিনকাকু বললেন, "শুধু এগুলো কেন, এই আমি একটা লিস্টি দিচ্ছি। প্রত্যেকটা শব্দের দ্বিতীয় সিলেব্‌লটা লক্ষ করো। সেখানেও বানানে ও-কার নেই, বলতে পারি অ-কার আছে কিন্তু অ-কারের তো কোনো চিহ্ন নেই—তবু 'ও'- ধরনের উচ্চারণ আসছে। দ্যাখো এই শব্দগুলো —

"কলম (কলোম্), সরল (সরোল্), কাতর (কাতোর্), সকল (সকোল্), আঁচল

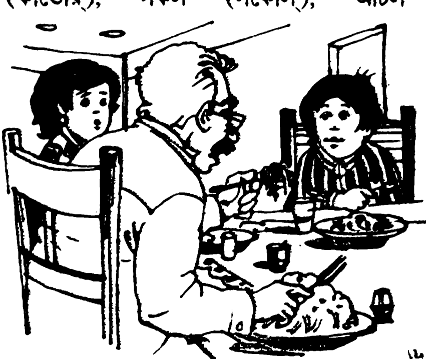

(আঁচোল্), পিছল / পেছল (পি/পে-ছোল্), এখন (অ্যাখোন্), আপন (আপোন্), অপমান (অপোমান্), অবসান (অবোশান্)।

"আবার দ্যাখো, তৃতীয় সিলেব্‌লেও 'ও' হচ্ছে উচ্চারণে। যেমন আনন্দ (আ-নোন্-দো), বিচিত্র (বি-চিৎ-ত্রো), অন্তত (অন্-তো-তো), আশ্চর্য (আশ্-চোর্-যো), আকৃষ্ট (আ-কৃশ্-টো)। বা চতুর্থ সিলেব্‌লে অতিরিক্ত (ও-তি-রিক্-তো),—অর্থাৎ শব্দের গোড়ায় না থেকে 'অ' ধ্বনি যদি অন্য যে-কোনো জায়গায় থাকে তাহলে সেটা সাধারণভাবে 'ও' হয়ে যায়।"

ভণ্টু জিজ্ঞেস করল, "এটা তাহলে অ-এর ও হওয়ার তিন নম্বর নিয়ম?"

বাবা বললেন, "কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে কেন? আমাদের 'অ'-টার দেখি কোনো ব্যক্তিত্ব নেই, যেখানে পাচ্ছে সেখানেই বদ্‌লে 'ও' হয়ে যাচ্ছে।"

"হ্যাঁ," হিগিনকাকু মুখটা করুণ করে মাথা নাড়লেন, যেন 'অ'-এর দুর্দশায় তাঁর চোখে জল আসছে প্রায়— "বেচারা 'অ'। এর হেনস্তাই সবচেয়ে বেশি।"

ভণ্টু বলল, "কিন্তু এই শব্দের গোড়ায় না থাকলেই 'অ' 'ও' হয়ে যাবে, এ কী-রকম কথা!" হিগিনকাকু বললেন, "তবে শোনো। আমরা যখন শব্দ উচ্চারণ করি, তখন একটা জিনিস ঘটে। তাকে বলে স্ট্রেস, ঝোঁক বা শ্বাসাঘাত। ইংরেজিতে শব্দের কোন্ সিলেব্‌লের ওপর এই ঝোঁক পড়বে তার বাঁধা নিয়ম আছে, যেমন রিমেম্‌বার, ইলেক্‌ট্রিক, ইলেকট্রিক্যাল, ইলেক্‌ট্রিসিটি। কিন্তু বাংলায় সাধারণভাবে আমরা শব্দের গোড়াকার সিলেব্‌লে ঝোঁক দিই। এখন গোড়ায় খানিকটা জোর দিয়ে ফেলার ফলে তারপর ঝোঁকের মাঝপথে দম ফুরিয়ে যায়, তখন ঠোঁট বলে, "আমি বাপু ক্লান্ত, 'অ' বলতে হলে যতটা খুলতে হবে আমি অতখানি খুলতে পারব না।" তখন ঠোঁট কষ্টেসৃষ্টে 'ও' পর্যন্ত খোলে। এখানে 'অ'-এর 'ও' হওয়া ঐ দম ফুরোনোর জন্যে।"

ভণ্টু বলল, "কী কাণ্ড, এ তো শুধু গেঁতোমির জন্যে।"

হিগিনকাকু বললেন, "নিশ্চয়ই। তাতে আরো একটা কেলোর কীর্তি ঘটেছে।"

(ক্রমশ)

মিলি আর অত ছোট নেই

প্রসাদ

শ্রীমতী চামেলি রায় এখন আর ছোট্ট মেয়েটি নেই, সামনের জন্মদিনে তার বয়স হবে দশ বছর। তার খুব ইচ্ছে করে দাদার বন্ধুরা এলে তাদের সঙ্গে বসে বড়দের মতো গল্পগুজব করতে, ক্রিকেট খেলা-টেলার কথা বলতে। সেদিন মদনদা এসেছিল, কী-সব কথা হচ্ছিল দাদার সঙ্গে ইংল্যাণ্ডের ক্রিকেট-দল নিয়ে। মিলি সব কথা ভাল বুঝতেও পারছিল না, কিন্তু তার ভাল লাগছিল শুনতে।

"When are they coming to India, Dada?" Milly asked.

Chambal seemed surprised and said, "When are *who* coming to India?"

"The English team, silly. Who else?"

"Name me at least one player of the English team," Chambal challenged his sister.

Milly named three.

Chambal was silenced for the moment, but Madan-da wanted to test her knowledge of cricket further.

He asked, "What is M.C.C.?"

Chambal said, "If .you can answer that I'll buy you a season ticket for the Test in Calcutta."

The letters M.C.C. meant nothing to Milly, but she was not going to allow her brother the pleasure of hearing her say so.

So she said, "You buy me a ticket for the Test? I like that! And who is going to buy *you* a ticket?

This was too much for Chambal.

With excessive politeness he begged a favour of his sister. "Will you do us a favour, Milly? Get out of here, will you? We've no time ~~for~~ baby-talk."

"Oh, let her stay," Madan-da said. "Girls are taking a lot of interest in cricket these days. It may do them some good, too, keeping them away from their silly games."

বয়ে গেছে মিলির সেখানে বসে থাকতে। বাইরের ঘরে গিয়ে দেখল বাবা কার সঙ্গে যেন কথা বলছেন।

"Are you sure they're going to find you a good flat?" Daddy asked.

"I hope they can."The gentleman replied. "It will save me a lot of trouble if they do."

লক্ষ করো:

Name me three players.
I'll buy you a ticket.
She didn't allow her brother the pleasure of hearing her.
Buy me a ticket.
Do us a favour.
It may do them good.
Find me a flat.
It'll save me trouble.

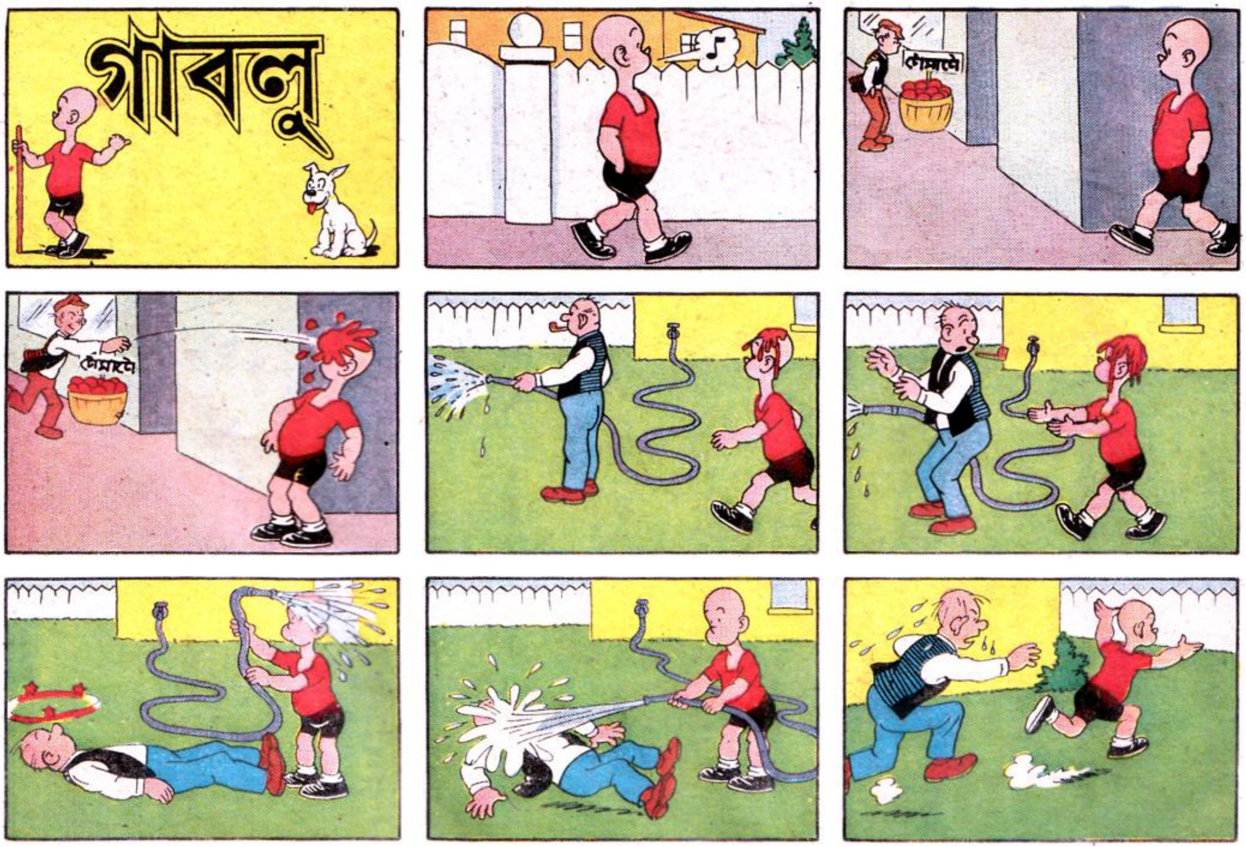

গাবলু
টোম্যাটো

বাঘা

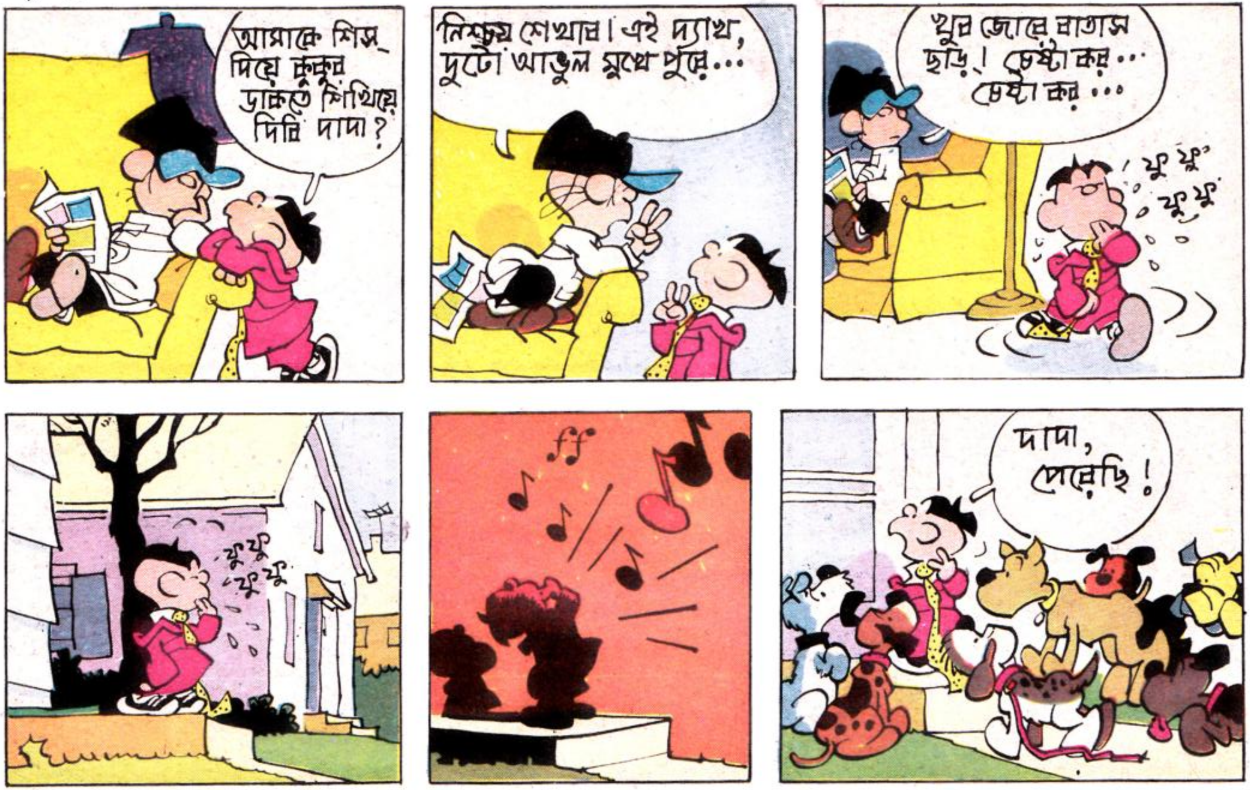
আমাকে শিস্ দিয়ে কুকুর ডাকতে শিখিয়ে দিবি দাদা?
নিশ্চয় শেখাব। এই দ্যাখ, দুটো আঙুল মুখে পুরে...
খুব জোরে বাতাস ছাড়্! চেষ্টা কর্... চেষ্টা কর্...
ফু ফুঁ ফু ফু
ফু ফু ফু ফু
ff
দাদা, পেরেছি!

আঁকো

ডিম থেকে পাখি

ডিম থেকে পাখি বের হয়ে নিজের খাবার খুঁজে বেড়াচ্ছে। তুমি চাইলে অন্য পাখি আকাশেও খাবার ধরবার জন্যে পাখনা মেলে উড়বে।

—রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

শেখো

কার্ডবোর্ডের কাজ
খেলনা সোফা

চৌকো বোর্ডকে সমান ৯ ভাগে ভাগ করে নাও—যেমন নকশায় দেখানো আছে। এবার চৌকোর দাগগুলোর মধ্যে ২ নং চৌকো দুটির ক ও খ অংশগুলো কাঁচি দিয়ে চিরে রাখো। এবার ফোঁটা-ফোঁটা দাগ-বরাবর চাপ দাও ভাঁজের সুবিধার জন্যে। ভাঁজ অনুযায়ী মুড়ে আঠা দিয়ে আটকাতে পারলেই নকশার সোফা তোমার সামনে পাবে।

জেনে রাখো—(১) সোফার দু'পাশের হাতলের জন্যে আগে থেকেই নকশায় (১·নং) দেখানো কালো অংশটুকু গোল করে কেটে বাদ দিয়ে নেবে। (২) মোটা বা সমান কাটা না হলে শিরিষ কাগজ দিয়ে ঘসে নিলে সমান হবে।

—কারিগর

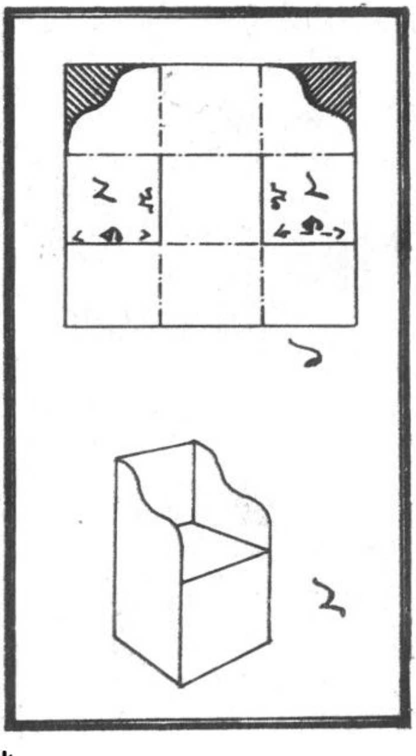

নিউট্রিন করে রোল স্বাদে-গন্ধে মন-প্রাণ উতরোল !

রকমারি রোলের ভাণ্ডার—কুচমুচ, মুচমুচ, মজাদার !

চাকুম চাকুম খাসা মিষ্টি দিয়ে ঠাসা!

নিউট্রিন কন্‌ফেক্‌শনারী কোম্পানী লিঃ
পালমানের রোড, চিত্তুর-৫১৭ ০০২ (অন্ধ্র প্রদেশ)

nutrine

CAS/NC 56/81 BEN/D

সেই পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যকর অনুভূতির জন্য

লাইফবয় পার্সোনাল

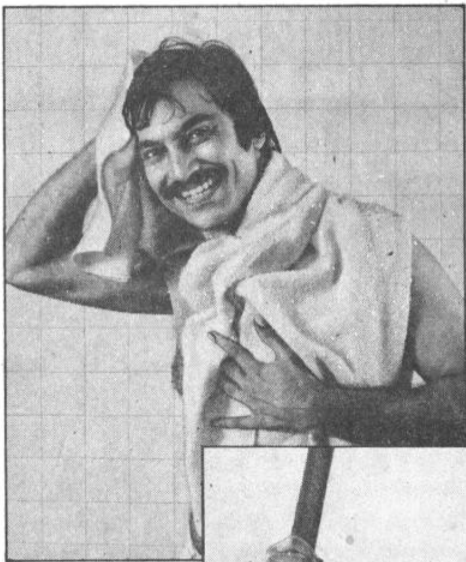

নতুন লাইফবয় পার্সোনাল সেই চির পুরাতন লাইফবয়ের মতই ধুলোময়লার বীজাণু দূর করে...এর সুপ্রচুর ফেনা ও মনমাতানো সুগন্ধ আপনাকে এনে দেয় একটি পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যকর অনুভূতি। তেমনি আকর্ষণীয় এর গড়ন ও মোড়ক লাইফবয় পার্সোনাল দিয়েই স্নান করুন আধুনিক যুগের আধুনিক সাবান!

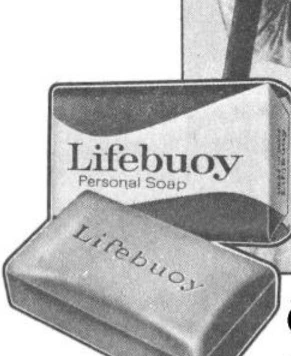

লাইফবয় পার্সোনাল

স্নানে আনে এক অপূর্ব তা

হিন্দুস্থান লিভার-এর একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

লিন্টাস-LP.10